আ'লা হযরত দর্শন

রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ

মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

Sunni-Encyclopedia

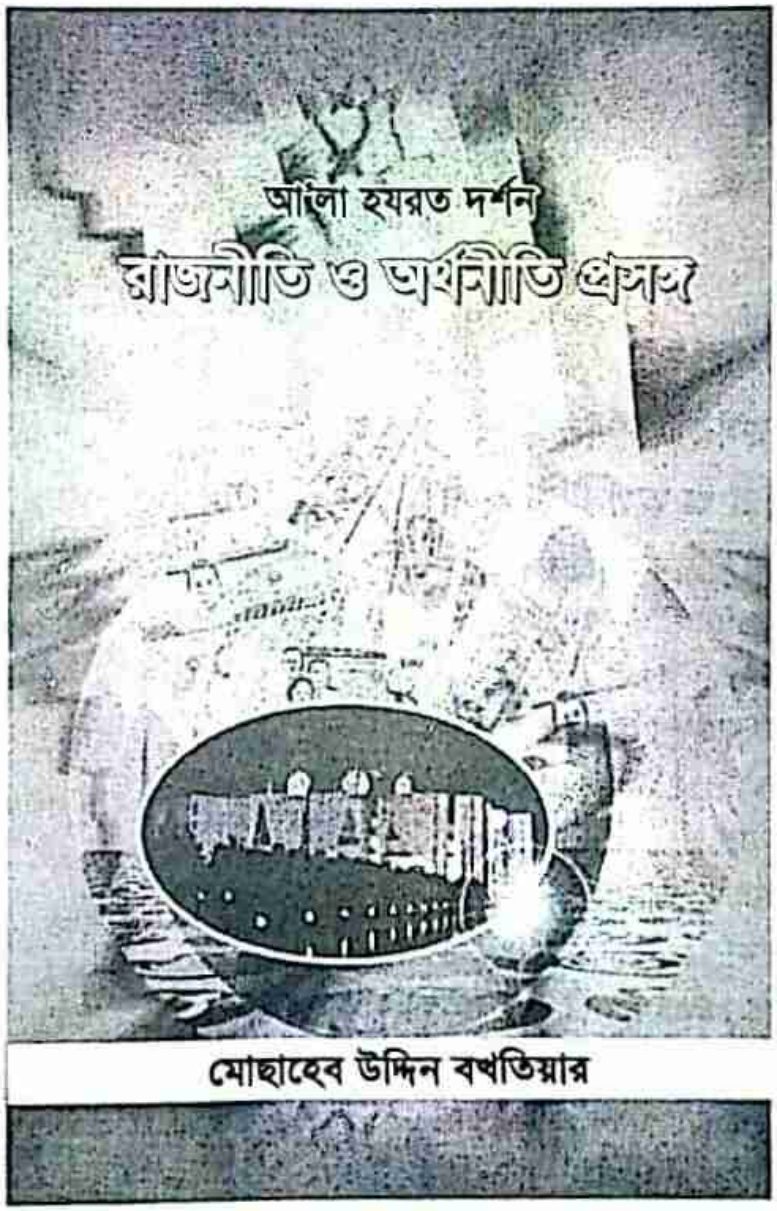

PDF By Rezaul Mustofa Reza
Sunnipedia.blogspot.com

PDF By Rezaul Mustofa Reza
Sunnipedia.blogspot.com

আ'লা হযরত দর্শন
রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ

। মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার ।

। প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ ফজলুল করিম তালুকদার
মোবাইল : ০১৭১২০৯১৪৮৫
। প্রথম প্রকাশ ঃ
১২ রবিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী, ৫ই জুন ২০০১ সাল।
। দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
১ মহররম ১৪৩৪ হিজরী, ১৭ নভেম্বর ২০১২ সাল।
। কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ
জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬
। মূল্য ঃ ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

Written by Mosahave Uddin Boktiar, Published by Mohammed Fazlul Karim Talukder, A Publication of Karim's Prokashon, 43, Momin Road, Chittagong, Ist Edition 5 June 2012, 2nd Edition 17 November 2012.
Price : 50/-taka, U.S $ 2.00 Only.

PDF By Rezaul Mustofa Reza
Sunnipedia.blogspot.com

অভিমত

উপমহাদেশের যে ক'জন মনীষীদের নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গবেষণা চলছে, তাঁদের মধ্যে মহান মুজাদ্দিদ, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আহমদ রেযা খান বেরলভী (রঃ) ছিলেন অন্যতম। তিনি কেবলমাত্র গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমে দ্বীন ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ভাষাবিদ, শ্রেষ্ট মুফাস্‌সিরে কুরআন, মুহাদ্দিস, যুগশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট তার্কিক, আধ্যাত্মিক সাধক, সত্যের প্রচারক, মুফ্‌তী ও একজন আদর্শ বিপ্লবী সংস্কারক। এক কথায় তিনি ছিলেন ইসলামী পূণর্জাগরণের মহান দিকপাল এবং ইসলামের মূলস্রোত সুন্নীয়তের পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন এক বিরল প্রতিভা। বড় ছোট সব মিলে তাঁর দেড় সহস্রাধিক পুস্তক বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সকল পুস্তক সত্যান্বেষী মানুষের জন্য সংকট মুক্তির পাথেয় স্বরূপ। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন শোষণের চরম দুর্দিনে উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি অঙ্গনে সঠিক দিক নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে তিনি কালজয়ী অবদান রেখে গেছেন। উপমহাদেশের ধর্মীয় অঙ্গনে ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়া ও অবাঞ্চিত মদদে সঠিক সুন্নীয়তের বিকাশ যখন রাহুগ্রস্ত হয়েছিল, ঠিক এমনি সময়ে সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধে ইমাম আহমদ রেযা খান (রঃ) এর কলম যুদ্ধ শুরু হয়। তিনি ওহাবী, দেওবন্দী, লা-মাযহাবী, কাদিয়ানী, নদভী ও শিয়াসহ সকল বিপথগামীদের যাত্রা থামিয়ে দেন এবং ইসলামের

নামে তাদের সকল অপব্যাখ্যার খন্ডন করেন। তুলে ধরেন ইসলামের সঠিক রূপরেখাকে। ফলে বিভ্রান্তির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায় অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান। শুধু তাই নয়, ইসলামী আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংরক্ষণের পাশাপাশি অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও দার্শনিক চিন্তা চেতনার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক দর্শনকে তুলে ধরেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিহত করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

বিশ্বের আনাচে কানাচে আজ মুসলিম উম্মাহ্ নিষ্পেষণের শিকার। নিজেদের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ড ইসলামের নামধারী বাতিল শক্তির কালো থাবা, মুসলিম উম্মাহ্কে বিশ্ব পরিক্রমায় বৃত্তচ্যুত করেছে। আমরা এ অবস্থার নিস্কৃতি চাই, দুঃখের রজনীর অবসান চাই, মানবতার উন্নয়ন চাই, হিংসা-দ্বেষ, অহমিকা ও অনৈক্যের অবসান চাই, অপরাধমুক্ত সমাজ চাই, মানব কল্যাণে আত্ম নিবেদিত হতে চাই, ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ চাই, অপরাধমুক্ত সমাজ চাই, সুশীল শান্ত বিশ্ব চাই, সুন্নীয়তকে সত্যিকার অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই। জগৎ, জাতি ও যুগের এ মহা সন্ধিক্ষণে ও সংকটকালে আজ আ'লা হযরতের আদর্শের অনুশীলন ও বাস্তবায়ন বড় বেশী প্রয়োজন।

আ'লা হযরত (রঃ) এর সমস্ত সৃষ্টিকর্ম ও তাঁকে নিয়ে লেখা প্রায় সকল গ্রন্থাদি উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় হওয়াতে এ দেশের বাংলা ভাষাভাষী বিশাল জনগোষ্ঠি তাঁর মহান চিন্তাধারার সাথে সুপরিচিত হতে পারছেনা। বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক জনাব মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার সাহেব রচিত "আ'লা হযরত দর্শন ঃ রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ" শীর্ষক পুস্তিকাটি এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি সাহসী উদ্যোগ ও সময়ের দাবী। আমি এ মহান কর্মের জন্য জনাব মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার সাহেবকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাই এবং পুস্তিকাটির বহুল প্রচার ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহান উদ্যোগকে কবুল করুন। আমিন।

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

PDF By Rezaul Mustofa Reza
Sunnipedia.blogspot.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রকাশকের কথা

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ও মহান সংস্কারক। পবিত্র হাদিস শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী মানবতা যখন সৎ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তখনই মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদের দিয়ে মানুষকে সমস্ত কুসংস্কার অন্যায়-অনাচার আর অসহনীয় পরিবেশ থেকে মানবতাকে মুক্ত করেন। এ সমস্ত মোজাদ্দিদগণ সাধারণতঃ মহান রাব্বুল ইজ্জতের মনোনীত হয়ে হিজরী শতাব্দির শেষ প্রান্তে এবং পরবর্তী শতাব্দির কয়েক দশক ধরে তাঁরা সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। এতে করে মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্তি অর্জন করেন। মূলতঃ আ'লা হযরতও তেমনি এক শতাব্দি সেরা সংস্কারক ও মুজাদ্দিদ। তার গতিশীল কর্মসূচী ও কর্মচাঞ্চল্যতা শুধুমাত্র এ উপমহাদেশের মানুষের জন্য নয় বরং সমগ্র জাহানের জন্যে এক অনন্য রহমতের ঝর্ণা ধারা বলে খ্যাত। আ'লা হযরত শুধুমাত্র একজন বরেণ্য আলেমে দ্বীন ছিলেন তা নয় বরং তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অনাবিস্কৃত বিশ্বকোষ। আ'লা হযরত তার ৬৫ বৎসরের হায়াতে জিন্দেগীতে এমন কিছু কাজ করে গেছেন যা চিরদিন ধরে বিশ্ব মানবতাকে মুক্তির পরশ আর ঠিকানা নির্দেশ করবে নিঃসন্দেহে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ৭২টিরও বেশী শাখায় আ'লা হযরতের দেড় সহস্রাধিক মৌলিক গ্রন্থ ও লেখনির সন্ধান পাওয়া যায় সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী। তবে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন আ'লা হযরতের প্রতিটি পাণ্ডুলিপি পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষনে এমন কোনো বিষয় খুঁজে পাওয়া যাবে না যাতে আ'লা হযরতের জ্ঞান ভান্ডারের কলম আঁছর কাটেনি। একজন আলেমে দ্বীন হিসেবে ধর্মীয় জ্ঞানের লেখনীতো আছেই তার উপর পাশ্চাত্য জগৎ যে বিজ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতি, সমরনীতি, দর্শন, গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, শিল্প-সাহিত্য প্রযুক্তি দিয়ে সারা বিশ্বকে কাবু করে রেখেছে সে সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আ'লা হযরতের রচনা শৈলী কত যে উঁচুমানের ও যথাসিদ্ধ জ্ঞানী মাত্রেরই অনুমেয়। তবে পরিতাপের বিধয় হলেও সত্য যে, আ'লা হযরতকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী ২৭টির ও বেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষণার হৈ চৈ সৃষ্টি হয়েছে

সে তুলনায় আমাদের দেশে এখনও অনেক বেশি অপরিচিত।
এতদিন ধরে আ'লা হযরতের আলোকময় জীবন প্রণালী ও লেখা-লেখি সম্পর্কে আমাদের দেশের মাদ্রাসা সমূহে বহুলভাবে পরিচিতি থাকলেও আ'লা হযরতকে আমরা গণ মানুষ ও সু-বিদ্যার্জনের কাছে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। অথচ আ'লা হযরতই এতদঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনা আর স্বাধীনতার একমাত্র প্রতীক। কিন্তু তারচে অনেক কর্মভূমিকা রেখে বেশী পেয়েছে এমন মানুষের সংখ্যাও এদেশে কম নয়। যারা আ'লা হযরতের ব্যক্তিত্ব আর কর্মস্রোতে সহজেই নিঃশেষ যোগ্য।
অবশ্য ক'বছর ধরে আ'লা হযরত ও তার লেখনীকে ভিন্নভাবে গণ মানুষের দুয়ারে পৌছাতে কিছু তরুণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তন্মধ্যে আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নিজ ভূখন্ড পেরিয়ে ভারত, পাকিস্থানসহ আন্তর্জাতিকভাবে এদেশের আ'লা হযরত চর্চা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। তার দেখাদেখি আ'লা হযরত চর্চা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে মাঠ পর্যায়ে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে জাতীয় পর্যায়ে আ'লা হযরত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে নিঃসন্দেহে। তবে এক্ষেত্রে সবছে বেশী যাঁর ভূমিকা তিনি হলেন কুতুবুল আউলিয়া রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরিকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। পঞ্চাশের দশকে হুজুর কিবলাহ্ মসলকে আ'লা হযরতের ভিত্তিতে যদি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার বুনিয়াদ না দিতেন তাহলে আ'লা হযরতকে জানবার কোনো সুযোগই আমাদের হতোনা। পরবর্তীতে গাউসে জামান হুজুর কিবলাহ্ হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদের সূচিত কর্মধারাকে পরিস্ফুটনে বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ হিসেবে যে গুরু দায়িত্ব পালন করেন তা বলা বাহুল্য। আজকের এ মুহূর্তে উপরোক্ত দু'মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি অযুত শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাই। সে সাথে আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি , আল্লামা আবিদ শাহ্ মোজাদ্দেদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ছাড়াও বর্তমান সময়ের সম্মানিত ওস্তাজুল ওলামাদের প্রতিও আ'লা হযরত চর্চার ক্ষেত্রে অবদান বা যার জন্যে হৃদয়ের গভীর আকুলতা আর শ্রদ্ধা জানাই। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে সুন্নীদের একমাত্র জাতীয় ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা গঠনতান্ত্রিক কেন্দ্রিয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আ'লা হযরত চর্চা অব্যাহত রাখে। এছাড়াও আরো কিছু প্রতিষ্ঠান বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সীমিত পরিসরে আ'লা হযরতের উপর কাজ করছে। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রকৃত পক্ষে আ'লা হযরতের গ্রন্থগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আত্ম নিবেদনের যে সুর খুঁজে

পাওয়া যায় তাঁরই নিরিখে আ'লা হযরত দর্শন প্রতিষ্ঠিত।

মূলতঃ এ দর্শনেই সমস্ত-জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনন্য আঁধার 'আল-কুরআন ও 'আল-হাদিসের বিশেষত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর এ বিশেষত্বই আ'লা হযরতের সমস্ত পংক্তিমালাকে ও বক্তব্যকে সফলতায় আসীন করেছে। আ'লা হযরত আক্বিদার প্রশ্নে যেমন কারো সাথে আপোষ করতেন না, তেমনি তার লিখনী ও বক্তব্যের সাথে তিনি সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও অটল থাকতেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তৎকালে আ'লা হযরত দ্বি-জাতিতত্ত্বের সার্থক স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তিনি ছিলেন এতদ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষনের অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়। যদিও আ'লা হযরত সক্রিয় রাজনীতিতে তেমনটা বেশী সময় ব্যয় করতে পারেননি তবুও আ'লা হযরত একজন ভারতবাসী হয়েও দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা দিয়ে যে কয়টি গ্রন্থ রচনা করেন তার নিরিখেই মূলতঃ আল্লামা ড. ইকবাল পৃথক রাষ্ট্র পকিস্তানের স্বপ্ন দেখেন এবং বাস্তবায়নে ব্রতী লাভ করেন।

মূলতঃ উপমহাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে এ মহান ব্যক্তিত্বের এ মহান চেতনা ও দর্শন এবং একজন মুসলমানের জীবনে বৈধভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সমস্ত সূত্রের সংক্ষিপ্ত অঙ্কতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক একটি পুস্তিকা আপনাদের দ্বারে উপস্থাপিত করা হোক। প্রখ্যাত সংগঠন, প্রাবন্ধিক, গবেষক, লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ এডভোকেট আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার অত্যন্ত সতর্কতা আর সার্থকতার সাথে লেখাটি তৈরী করে আমাদের ছাপানোর সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁর শ্রম-মেধা-সময় আর লেখনীকে কবুল করুন। আমিন।

সে সাথে লেখাটির মান নির্ণয় করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক সম্মানিত শিক্ষাগুরু গ্রন্থ বহু প্রণেতা, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী বইটিতে অভিমত লিখে দিয়ে ধন্য করে যে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন সে জন্যে তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা আর মোবারকবাদ জানাই। অতি অল্প সময়ে প্রকাশনার মতো দূরুহ কাজটিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টি ফাঁকি দেয়া স্বাভাবিক। তবে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত। হাজার ব্যস্ততার মাঝেও আপনাদের হাতে পবিত্র জশ্নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এ আনন্দ ঘন মুহূর্তে বইটি তুলে দিতে পেরে নিজেকে ভারমুক্ত ও প্রফুল্ল মনে হচ্ছে। আপনাদের ভাল লাগা, না লাগা, সমালোচনা আর সমাদর পেলেই নিজেকে ধন্য আর পরবর্তী পদক্ষেপ উপযুক্ত মনে করবো। এ প্রত্যাশায়-

মুহাম্মদ ফজলুল করিম তালুকদার

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আস্ ছালাতু ওয়াস্ সালামু আ'লা সাইয়্যিদিল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালিম ওয়ালা আ'লিহি ওয়াসহাবিহি আজমাঈন

কৈফিয়ত

"আ'লা হযরত দর্শন রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ" গ্রন্থটি আমার মৌলিক কোনো রচনা নয়। আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহ)'র দেড় হাজার গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ের পর্যালোচনা মাত্র। অবশ্য, পর্যালোচনাগুলোও আমার নিজস্ব নয়। আমার আলোচনা গুলোর বেশির ভাগই মূলতঃ ইংরেজি থেকে অনুদিত; অবশ্য নিজস্ব বিশ্লেষণ-মন্তব্য ও রয়েছে। রাজনীতি বিষয়ের আলোচনা প্রফেসর ডঃ মাসউদ আহমদ রচিত 'The Reformer of the muslim world' গ্রন্থটির 'Political Activities' অংশ হতে নেওয়া হয়েছে। এই বইটি সরবরাহ করায় হাফেজ মনজুরুল আনোয়ার (তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, ষোলশহর, চট্টগ্রাম)' কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটির 'Political Activities' অংশটিতে আ'লা হযরতের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার কিছু বিশ্লেষণ ছিলো। যা, 'আ'লা হযরতের রাজনৈতিক দর্শন' সংক্রান্ত আমার আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এ প্রবন্ধটির লেখা শেষ করতে না করতে আমার হাতে এসে যায় আরো কিছু বই। এর মধ্যে আ'লা হযরতের অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত পুস্তক 'Economic Guide lines for muslims-Proposed By Imam Ahmed Raza Khan in 1912 A.D' ও রয়েছে।

এটি আ'লা হযরত রচিত 'তদবির এ ফালাহ ও নাজাত ওয়া ইসলাহ' গ্রন্থে প্রদত্ত অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনার বিশ্লেষণ মূলক পুস্তক। অর্থনীতির অধ্যাপক রফিউল্লাহ সিদ্দিকী (হায়দারাবাদ) প্রথমে উর্দুতে এ রচনা দাঁড় করান। পরবর্তীতে অর্থনীতির অপর এক প্রবীণ অধ্যাপক এম.এ.কাদির (সিন্ধু) একে ইংরেজিতে রূপ দেন। মুহাম্মদ আব্দুর রহিম (এপেক্স, চট্টগ্রাম), ইংরেজিতে লেখা আ'লা হযরত সংক্রান্ত বেশ ক'টি বইয়ের সাথে

এটিও আমাকে সরবরাহ করে। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

বিশেষ করে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সিনিয়র অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরীর অভিমতটি গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করবে। তাঁর মত মহান ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খাটো করতে চাইনা।

আসন্ন জশ্নে জুলুছ এ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে এই বইটি ছাপানোর আগ্রহ দেখিয়েছিল মুহাম্মদ ফজলুল করিম তালুকদার (কাটিরহাট, চট্টগ্রাম)। না হয়, এটি শুধু একটি প্রবন্ধই থেকে যেতো-বই হতোনা। তাঁকে ধন্যবাদ।

যেহেতু, কোনো পূর্ব প্রস্তুতি পরিকল্পনা ছাড়াই এ বিষয়ে হাত দিয়েছি; বিশেষতঃ নির্ধারিত দিন জশ্নে জুলুছ'র মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দিন বাকি, ঠিক এমন অবস্থাতে তাড়াহুরো করে লিখা বইটিতে অনেক ভুল-ত্রুটি ও অসামঞ্জ্যতা থাকা স্বাভাবিক। অর্থনীতি সংক্রান্ত কোনো মৌলিক জ্ঞান না থাকার ছাপও প্রকাশ পেতে পারে এ রচনায়। আমার ইংরেজি জ্ঞান ও অনুবাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং এ গ্রন্থের অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ের রচনাগুলোতে কোনো অসামঞ্জস্যতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা আ'লা হযরত বা বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ লেখকদের নয়; বরং আমার। কোনো সতর্ক এবং জ্ঞানী পাঠকের সংশোধনী মূলক সহযোগিতার জন্য আগাম কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থে 'ইমাম আহমদ রেযা; জ্ঞানের এক বিশ্বকোষ' নামে একটি অধ্যায় পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছে। আ'লা হযরত'র বৈচিত্র্যময় জ্ঞান ভান্ডার সম্পর্কে জানতে আগ্রহীদের জন্যই এটি সংযোজিত হয়েছে। 'প্রাক-পরিস্থিতি' শিরোনামের অধ্যায়টিতে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সংক্ষেপ চিত্র রূপায়িত হয়েছে। বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপট'র আলোকেই দেখতে হবে আ'লা হযরতের রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে। আ'লা হযরতের চিন্তাধারা সমাজ সংস্কারে পাথেয় হোক। এ কামনা করি।

মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার
৭ রবিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী
৩১ মে ২০০১ ইংরেজী

উৎসর্গ

বাংলাদেশে আ'লা হযরত চর্চার বুনিয়াদ স্থাপনকারী, শরিয়ত-ত্বরিকতের মহান কান্ডারী, গাউসে জামান, আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহ.)'র দস্ত মুবারকে।

PDF By Rezaul Mustofa Reza
Sunnipedia.blogspot.com

সূচী

প্রাক-পরিস্থিতি	১২
ইমাম আহমদ রেয বেরলবী (রহ)' রাজনৈতি দর্শন	১৮
অর্থনীতি	৩৬
পরিশিষ্ট	৪৪

PDF By Rezaul Mustofa Reza
Sunnipedia.blogspot.com

প্রাক-পরিস্থিতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দ্বিতীয় খলিফা ফারুকে আজম হযরত ওমর (রা)'র আমল (৮ম শতাব্দি) হতেই ভারতে ইসলামের আলো আসতে শুরু হয়েছিলো। আরবের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমেই এ যাত্রার উদ্বোধন হয়। তবে সমগ্র ভারতে ব্যাপকভাবে ইসলামের বিজয় শুরু হয় সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীব নওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতি (রা)'র আগমনের ফলে। ইসলামের আগে এখানে ছিলো হিন্দুদের দুঃশাসন। যারা বৌদ্ধদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিলো। নিজেদের মধ্যে উগ্রবর্ণবাদী ভেদাভেদ চালু করেছিলো। শাসকরা তথাকথিত উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। নিম্নবর্ণ বলে অভিহিত হিন্দুদের মানুষ বলেও গণ্য করা হতো না ব্রাহ্মণ্যবাদী এ শাসন ব্যবস্থায়। নির্যাতিত অসহায় এ মানুষ গুলোকে ব্রাহ্মণ্যবাদী জালিম শাসক ও ভ্রান্ত ধর্মের অন্ধকার গহ্বর থেকে আলোকে টেনে আনতেই সেদিন আল্লাহর এ মহান অলি গরীব নওয়াজ (রা)'র আগমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। ইসলামের শান্তি, উদারতা, সেবা ও সাম্যের অনুশীলনে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দির শুরুতে মাত্র ষোল জন ঘোড় সেনা নিয়ে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বঙ্গ বিজয় করলেন, আর মহা প্রতাপশালী স্বৈরশাসক লক্ষণ সেন রাজ্যের পশ্চাৎ দ্বার দিয়েই পালিয়ে বাঁচে। নির্যাতিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের সমর্থনের সুবাধেই এতো সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানরা এ বঙ্গেও ইসলাম নিয়ে আসতে পেরেছিলো। একাধারে হাজার বছরের প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও মুসলমানরা কখনো কারো উপর ধর্ম চাপিয়ে দেয়নি, বরং সকল ধর্মের প্রতি সাম্য দৃষ্টি ও সুশাসনের নজির স্থাপন করেছে। যেখানে হিন্দু আমলে অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব অকল্পনীয় ছিলো, সেখানে হাজার বছরের মুসলিম শাসনের শেষ দিনটিতেও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ট জাতি ছিলো হিন্দুরা, আর সংখ্যালঘু থেকে গেলো শাসক শ্রেণী, মুসলমানরা। ইসলামের উদার নীতির উদাহরণ আর কী হতে পারে? ইসলামের এমন উদার আচরণ সত্ত্বেও রাজ্য হারানোর ব্যথা ভুলতে পারেনি সে জালিম রাজাদের উত্তরসূরী হিন্দুরা। নানাভাবে চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে থাকে। তাদের এ চক্রান্তের আশানুরূপ ফলাফল আসতে শুরু করে সম্রাট আকবরের আমল থেকে। আকবরের নতুন ধর্মমত 'দ্বীনি ইলাহি' এর অন্যতম প্রতিফলন। আকবরের অতিরিক্ত হিন্দু প্রীতির সুযোগ নিয়ে এরা গরু জবাই নিষিদ্ধ করার আদেশটি ও আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। ঠিক এ সময়েই রাব্বুল আ'লামীন তাঁর এক মহান মুজাদ্দিদ' কে ভারত বর্ষে পাঠালেন। মুজাদ্দিদে আল ফেসানী সিরহিন্দি (রা)'র সংস্কার আন্দোলনের ঝড়ে, মুসলিম-

অমুসলিমের সম্মিলিত ধর্ম 'দ্বীনে ইলাহি' নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতার অভিযোগে কারাবন্দিও থাকতে হয়েছিলো তাঁকে এ জন্য। অবশেষে আকবর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে, মহান মুজাদ্দিদের অবদানে, গরু জবাইয়ের পুনঃ অনুমতি পেল মুসলমানরা। পরবর্তীতে জিন্দাপীর নামে খ্যাত সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব'র হাতে ইসলামের সঠিক আক্বিদা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির পুণর্গঠন হয়। তাঁর প্রচেষ্ঠায় সংকলিত 'ফতোয়া আলমগীরি' এখনো সুন্নি মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী আইন-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

দক্ষ শাসক ও ঈমানদার সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর থেকেই ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে মোগল সাম্রাজ্য। পারিবারিক কোন্দল, ক্ষমতার লড়াই ও সুযোগ সন্ধানী চক্রান্তকারীদের অপতৎপরতাকে কাজে লাগিয়ে অনুপ্রবেশ করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। শুরু হলো হিন্দু-ইংরেজ যৌথ ষড়যন্ত্র। এরই এক পর্যায়ে ১৭৫৭ সনে পলাশির ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে ভারত বর্ষে ইংরেজ শাসনের যাত্রা শুরু হয়, বাংলাকে দিয়ে। ভারত বর্ষের এ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের শাসন ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে, ইংরেজ-হিন্দু যৌথ অভিযানে, একে একে ভারত বর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ও বৃটিশ আধিপত্য বিস্তৃত হতে থাকলো। তিলে তিলে ধ্বংস হতে থাকলো মুসলিম জাতি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (মহা দুর্ভিক্ষ), চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রাতারাতি হিন্দুদের জমিদার আর মুসলমানদের প্রজাতে রূপান্তর করে। আর প্রজাদের উপর জমিদারদের নজিরবিহীন নির্যাতন ও শোষণের প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগি বাংলার মুসলমানদের একই দশার পুনরাবৃত্তি হতে থাকলো নতুন নতুন প্রদেশে। বাঁচার জন্যই শুরু হলো ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম। মুসলমানদের এ সংগ্রামকে নস্যাত করতে দরকার হয়ে পড়লো 'ভাগ করো-শাসন করো' নীতির অনুশীলন। অবশ্য, এ নীতি শুধু ভারতের জন্য নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যই প্রয়োগ করা হয়েছিলো। বৃটিশ'রা তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি তুরস্ক ভিত্তিক সুন্নি মুসলিম সালতানাতের পতন ঘটাতে, হাতে নিয়েছিল আরব দেশেরই কিছু প্রভাবশালী উচ্চ বিলাসী মুসলিমকে। তারা আরবদের ক্ষেপিয়ে ছিলো জাতীয়তাবাদের টোপ দিয়ে। এ জাতীয়তাবাদী প্রচারণার মূল কথা হলো 'আরবদের উপর অনারব (তুরস্ক)'র শাসন অপমানকর। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব'দের মধ্য হতে এ রাজনৈতিক প্রচারণায় নেমেছিলো নজ্‌দ'র মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী। একদিকে তুরস্ক বিরোধী, অপরদিকে ইসলামের মূলধারা সুন্নি মতাদর্শের স্বীকৃত আক্বিদা-বিশ্বাস বিরোধী, এ রাজনৈতিক ও ধর্ম বিচ্ছিন্ন ধারাটিই ইতিহাসে মুহাম্মদ ইবনে ওহাব'র নামানুসারে 'ওহাবী আন্দোলন', 'মুহাম্মদী আন্দোলন' হিসেবে পরিচিতি হয়ে আছে। সাথে সাথে নজ্‌দ'র এ ওহাবীদের আবির্ভাবের ফলে, নবীজি হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম'র একটি বিশেষ হাদীস 'নজ্‌দ থেকে শয়তানের শিং বের হবে' এর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেলো। বিশ্ব মুসলিমের উপর শয়তানের প্রভাব পড়ার সাথে

সাথেই মুসলমানদের বিশাল তুর্কী সালতানাতের পতন শুরু হয়ে গেলো। মধ্য প্রাচ্যে ইস্রাইল নামের প্রথম ইহুদী রাষ্ট্রের এবং প্যালেস্টাইনীদের জাজাবরি জিন্দেগীর সূচনা হলো। অবশেষে, তুর্কি সালতানাতের পতনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্ব অভিভাবক হারা হয়ে যায়। এবং নতুন করে, ইসলামের নামে অভিশপ্ত শয়তানের দল, নজ্‌দী-ওহাবী'দের ধর্মীয় ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যপ্রাচ্য তথা জজিরাতুল আরবে গেড়ে বসলো। এক পর্যায়ে ভারত বর্ষের মুসলমানদের ব্রিটিশ হঠাও আন্দোলন ঠেকাতে, সংগ্রামী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়োজনে সে বৃটিশদেরই ব্যবস্থাপনায় অবশেষে ১৯২১ সনে এ ওহাবী মতবাদ আমদানী করে এ ভারত বর্ষের তপ্ত কড়াইয়ে ঘি ঢালা হলো। সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভী'র এক দশকের (১৯২১-৩১) প্রচারণায় এবং ইংরেজদের সুনিপুন পৃষ্ঠপোষকতায়, এরা ভারত বর্ষের মুসলমানদের আক্বিদাগত ও রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত করতে সক্ষম হলো। ফলে, অতি সহজে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ ও সুগম হতে থাকলো। ভারতের শিখ অধ্যুষিত পাঞ্জাব রাজ্যটি তখনো ইংরেজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলো। এ রাজ্য দখল করতে পারলেই সমগ্র ভারত বর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হয়। এ কাজে ইংরেজদের 'ওহাবী কৌশল' খুব ফলপ্রসূ হলো। ইংরেজ বিরোধী মুসলমান ও শিখদের মধ্যে যুদ্ধ লাগানোর মাধ্যমে উভয় পক্ষকে দুর্বল করার উদ্যোগ নেওয়া হলো। ইংরেজ দালাল সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভী'রা শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিলো। সে জিহাদের জন্য এ বাংলা থেকে ও সৈন্য সংগ্রহ করে অস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি নিয়ে সীমান্ত প্রদেশ পাঞ্জাবে রওয়ানা হয়ে গেলো ওহাবীরা। ইংরেজ করদ রাজ্য টংক এর উপর দিয়ে, ইংরেজ সরকার কিছু না জানার ভান করলো। কারণ, এদের পাঞ্জাব দরকার। অবশেষে, শিখ ওহাবী যুদ্ধ হলো। কিন্তু ইতোমধ্যে সীমান্তের পাঠান মুসলমানরা ওহাবীদের ত্যাগ করলো এবং তাদের হাতেই বালাকোটে (১৮৩১) নিহত হলো ওহাবীদের এই দুই গোড়াপত্তনকারী জাতীয় নেতা, সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভী। যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে সাথে শিখদের ও ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছিলো। আর এ যুদ্ধের পর পরই ইংরেজ নীল নক্সার বাস্তবায়ন হলো, ইংরেজদের পাঞ্জাব অধিকারের মাধ্যমে। ১৮২১ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সময়টি ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যময় একটি ক্রান্তিকাল ছিলো। ইসলামের মূলধারা সুন্নি মতাদর্শের দায়িত্বশীল ওলামাদের এখন থেকে একই সাথে প্রকাশ্য শত্রু ইংরেজ এবং ঘরশত্রু বিভীষণ ওহাবীদের মোকাবিলার মতো কঠিন ব্রতে নামা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। আর এমন এক ভয়াবহ যুগ সন্ধিক্ষণে, যিনি ইসলাম ও মুসলমানদের নেতৃত্বের হাল ধরেছিলেন, তিনি সে শহীদ ব্রিটিশ যোদ্ধা এবং ইমামে আহলে সুন্নাত, আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রহঃ)। তাঁকে একদিকে ওহাবীদের প্রচারিত ও প্রকাশিত, ঈমান বিধ্বংসী আক্বিদাগুলোর বিরুদ্ধে, অপরদিকে ইংরেজ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধ চালাতো হতো। ইসমাইল দেহলভী লিখিত এবং সৈয়দ আহমদ

বেরলভী অনুমোদিত জঘন্য বই 'তাকবিয়াতুল ঈমান'র খন্ডন করে বই লিখা থেকে শুরু করে, জনগণকে ওহাবী ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার মতো গুরু দায়িত্ব ও পালন করতে হয়েছিলো তাঁকে কিন্তু ততদিনে ইংরেজের শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছে, ওহাবী ও হিন্দুদের সহযোগিতায়। অবশেষে, ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধে, মুসলমানদের পরাজয়ের মাধ্যমে, একশ বছরের (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীঃ) ধারাবাহিক পরিণতির অনিবার্য ফল স্বরূপ, সমগ্র ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম হয়ে গেলো। সর্বশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন একজন দরবেশ, নবী প্রেমিক, সূফি, কবি ও সুন্নি মুসলমানদের অভিভাবক। তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করলেন। সুন্নি মুসলমানরা সর্বশেষ রাষ্ট্রীয় ত্রাণকর্তাকে ও হারালেন। সর্বশেষ অবলম্বন ও ইমাম ছিলেন, আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রহঃ)। বৃটিশ সরকার রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে তাঁকেও নির্বাসন দিল আন্দামান দ্বীপে। জগৎ বিখ্যাত এ আল্লামা আন্দামান দ্বীপেই ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। এ সময় দেশের সুন্নি মুসলমানদের আন্দোলনের অনুপ্রেরণা দিতে কাফনের কাপড়ে কয়লা দিয়ে লিখে গেলেন এক ঐতিহাসিক বিপ্লবী রচনা 'আসসাওরাতুল হিন্দিয়া'। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পর্যায় এমন কী তাঁর পান্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট ইংরেজ জেলারের আবেদনের প্রেক্ষিতে, লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিল তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলো বটে। কিন্তু, তাঁর ছেলে শামসুল হক খায়রাবাদী এ মুক্তির নির্দেশ নিয়ে আন্দামান পৌঁছেই দেখতে পেলেন দ্বীপের বাসিন্দারা একটি জানাজার নামাজে দাঁড়িয়েছে। তিনিও শামিল হলেন এবং জানতে পারলেন, জানাজাটি আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী নামক এক বিশাল ব্যক্তিত্বের। তিনি আন্দামান থেকে পিতাকে নিয়ে আসতে পারলেন না, বৃটিশদের মুক্তিও কোনো কাজে আসেনি। খায়রাবাদী (রহঃ) বৃটিশের কবল থেকে নিজে চিরমুক্তি পেলেন; আর আমরা তাঁর ছেলের মাধ্যমে পেলাম এক টুকরা কাফনের কাপড়ে কয়লার লেখা এক অবিস্মরণীয় কেতাব। ১৮৫৭ সনে, এ দুই ব্যক্তিত্বের নির্বাসন ও জীবনাবসানের মধ্য দিয়েই ভারত বর্ষে সুন্নিয়তের নেতৃত্বের অবসান ঘটে। সুন্নিদের রাজ্য গেলো, রাজা গেলো এবং ইমাম ও গেলো। ১৮৫৭ পরবর্তী এ সময়টাই ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসের ভয়াবহতম অধ্যায়। আর এমন একটি সময়ের শুন্যতা পূরণের জন্যই, আল্লাহর অপার কৃপায় তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামের এ উম্মতকে সঠিক দিক নিদের্শনা দিতে, একজন মহান সংস্কারক আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর তিনিই ছিলেন চৌদ্দশ হিজরীর মুজাদ্দিদ, আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহঃ)।

তাৎপর্যময় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগের বছর ১৪ জুন ১৮৫৬ (১২৭২ হিজরী) সনে ভারতীয় মুসলমানদের এ মহান ইমামের জন্ম হয়, ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরলীতে। শৈশব থেকেই অলৌকিক মেধার পরিচর্যায় ও আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণে বেড়ে ওঠা তাঁর সমগ্র জীবন ছিলো বিস্ময়কর কল্প কাহিনীর মতো। মাত্র চার বছর বয়সে আলিফ, বা, তা, ছা পড়ার এক পর্যায়ে লামা'লিফ (লাম+আফিল) এর

রহস্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে হতবাক করে দিয়েছিলেন ওস্তাদজি'কে। কুরআনে করিমের ভুল উচ্চারণ পড়াচ্ছিলেন ওস্তাদ, অথচ শিশু আহমদ রেযা বার বার শুদ্ধটিই বলে যাচ্ছিলেন। কুরআন শরীফের অন্য একটি কপি থেকে এ শুদ্ধতা নির্নীত হবার পর, দাদা তাঁকে ওস্তাদের অনুসরণ না করার রহস্য জিজ্ঞেস করায়, তিনি বলেছিলেন, আমি বার বার চেষ্টা করেছি অথচ মুখ দিয়ে বের হয়েছে শুদ্ধটিই (আলহামদুলিল্লাহ), (ইয়াদে আ'লা হযরত, আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী নক্‌শবন্দী পৃষ্টা-২০ ও হায়াতে আ'লা হযরত (করাচী) ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-৩২)

সুতরাং শৈশব থেকেই আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে ও নিয়ন্ত্রণে থেকে তিনি একটি অসহায় মুসলিম জাতির সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং তাদের একটি নির্ভুল দিক নির্দেশনা দিয়ে যান। হযরত খায়রাবাদীর মতো তাঁকেও একই সাথে সঠিক আক্বিদার সংরক্ষণ, ভ্রান্ত ওহাবী ও কাদিয়ানী মতবাদের খন্ডন, ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুনের সংরক্ষণ-সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলমানদের দিতে হয়েছিলো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা। লড়তে হয়েছিল সাম্রাজ্য বাদী বৃটিশ রাজশক্তি, ষড়যন্ত্রকারী হিন্দু কুটকৌশল এবং এতে বিভ্রান্ত মুসলিম রাজনীতিকদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে একই সাথে।

এখানে একটি বিষয় জানা দরকার যে, ইংরেজরা ক্ষমতা নিয়েছিলো সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর থেকে। যিনি একজন সত্যিকারের সুফিবাদি সুন্নী মুসলমান এবং আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রহ)'র মুরীদ ছিলেন। তাই সুন্নিদের প্রতিই তাদের বিদ্বেষ এবং সন্দেহ ছিলো বেশি। এজন্য তারা সুন্নিদের মধ্যে অনৈক্য, আক্বিদাগত বিভ্রান্তি, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা ও অর্থনৈতিক দৈন্যতা ছড়িয়ে দিতে বারবারই ওহাবী মোল্লাদের কাজে লাগায়। নিয়মিত বেতন-ভাতা পাওয়া এসব ওহাবী-দেওবন্দী মৌলভীরা, একদিকে ইসলামের মূলধারা সুন্নি মতাদর্শের চিরাচরিত আক্বিদা বিশ্বাস ও সংস্কৃতি বিরোধী এক একটি কিতাব লিখে এবং বক্তব্য রেখে সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে আক্বিদাগত বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। অপর দিকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ছল ছুতো প্রদর্শন করে এক এক নিত্য নতুন রাজনৈতিক ফতোয়ায় লিপ্ত তাঁকে। যা একদিকে আক্বিদা গত ভাবে, অপর দিকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবে মুলমানদের রসাতলে নিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের চিরচারিত আক্বিদা-বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করতে এরা বিভিন্ন কিতাব লিখতে থাকে কিছু জঘন্য কুফরি বক্তব্য, যেমনঃ আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, নামাজে নবীজির (দঃ) খেয়াল আসা গরু, গাধার খেয়ালের চেয়েও মারাত্মক, নবী (দঃ) কে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করলে চলবে, যাঁর নাম মুহাম্মদ (দঃ) বা আলী (রাঃ) তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। খাতামান নবীয়িন মানে শেষ নবী নয়, নবী (দঃ)'র অদৃশ্য জ্ঞান নেই ইত্যাদি অসংখ্য বদ-আক্বিদা (নাউজুবিল্লাহ)। আ'লা হযরত এ জাতীয় ওহাবী আক্বিদার খন্ডনে এবং বিশুদ্ধ আক্বিদার পরিচয় তুলে ধরে শত শত কিতাব রচনা করে, তাদের কবর রচনা করে গেছেন।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন নামক নাটকের আড়ালে, এক সময় ভারত বর্ষে চলছিল

এক জঘন্য আতাঁতের রাজনীতি। মুসলমানদের হারানো এ ভারতবর্ষ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়ার এ নাটকে, ইসলামের নামে অভিনয় করছিলো ইংরেজ দালাল ওহাবী সম্প্রদায়। সরল-প্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে এ সময় এদের কিছু ফতোয়া ইংরেজ হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়ার জন্য, উক্ত প্রভুদের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষকে এরা 'দারুল হরব' ফতোয়া দিয়ে দেয়। 'দারুল হরব' ঘোষণার পর মুসলমানদের জন্য দেশ ত্যাগ (হিজরত) ফরজ এবং দেশে থাকলে সুদ হালাল হয়ে যায়। ফতোয়া দাতাদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কেউ দেশত্যাগ করলোনা, তারা হিন্দু মহাজনদের সাথে সুদী কারবারে মনোনিবেশ করে, আরাম-আয়েশে দিন কাটালো। অথচ, সরল মুসলমানদের অনেকেই ভিটে-বাড়ি সহায় সম্বল কম দামে বিক্রি করে আফগানিস্থানে আশ্রয় নিয়েছিলো। যারা এক সময় ভুল বুঝে দেশে ফিরে আসলেও নিঃস্ব ভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। ওহাবীদের এ ফতোয়া পরিপূর্ণ কাজে লাগাতে পারলে ভারতবর্ষে মুসলিম শুন্য হয়ে যেতো বিধায় কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই দেশ হিন্দুদের শাসনাধীন হয়ে যেতো। আর একই সময় আ'লা হযরত এ আত্মঘাতি ফতোয়ার বিরুদ্ধে কলম ধরে ভারতকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা দিয়ে, মুসলমানদের দেশত্যাগ থেকে রক্ষা করে, এক বিরাট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের নামে ও এরা গান্ধীর নেতৃত্বে মুসলমানদের উৎসর্গ করে হিন্দুদের 'স্বরাজ' তথা হিন্দু রাজ কায়েমে আদাজল খেয়ে নামে। তুর্কি টুপির পরিবর্তে গান্ধী টুপির ব্যবহার শুরু করে। গান্ধীকে মসজিদের মিম্বরে বসিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। হিন্দুদের সাথে একই আওয়াজে গরু জবাই বন্ধের দাবী জানায় এবং গরু জবাইয়ের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়। ঠিক তখন এই বিভ্রান্তি কর পরিস্থিতিতেই আ'লা হযরত পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করে- তাদের অপ রাজনীতির স্বরূপ উদঘাটন করেন এবং সঠিক রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করেন। শুধু তাই নয় হিন্দু মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি সুদের কারবার এবং বৃটিশ-হিন্দুদের কৌশল গত বাণিজ্য ফাঁদ থেকে মুক্ত করে, মুসলমানদের একটি আত্মনির্ভরশীল উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি প্রদান করেন অত্যাধুনিক ও কোরান-সুন্নাহ সম্মত ইসলামী অর্থনৈতিক রূপরেখা ১৯১২ সনে প্রদত্ত তাঁর অর্থনৈতিক নির্দেশনা গুলো সে সময়ের ক্ষতিগ্রস্থ মুসলমানদের অর্থনৈতিক পুণর্গঠনের এক মাইল ফলক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারতো। অথচ, রাজনৈতিক ও আক্বিদাগত অনৈক্যে জর্জরিত মুসলমানরা তাঁর এ নির্দেশনা গুলোকে মূল্যায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। যা পরবর্তীতে ১৯২৯-৩০ সনের মহামন্দা পরবর্তী কালের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনে, ১৯৩৬ সনে ইউরোপিয় অর্থনীতিবিদ J.M. Kaynes কর্তৃক উপস্থাপিত চিন্তাধারার আদিরূপ ছিলো। সময় মতো মুসলমানরা উক্ত তত্ত্বগুলো গ্রহণ করলে নিজেদেরকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আনতে পারতো। অবশ্য পরবর্তীতে তার রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দেরীতে হলেও মুসলমানদের পথ দেখিয়েছিলো। যা এখানে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহ)'র রাজনৈতিক দর্শন

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী রাহমাতুল্লাহ আ'লাইহি (১৮৫৬-১৯২১) ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ রায় বেরেলীর এক বিখ্যাত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিস্ময়কর মেধা শক্তির অধিকারী এ মুজতাহিদ আলেমের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় লেখা লেখিতে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে তাঁর জীবন কর্ম বিষয়ক গবেষণায় নিয়োজিতদের তথ্য অনুসারে তাঁর লিখিত কিতাবের সংখ্যা দেড় হাজারের কম নয়। কোরানে করীমের বিখ্যাত উর্দু অনুবাদ কানজুল ঈমান গ্রন্থ, প্রতি খন্ড হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত বারো খন্ডের বিশাল ফতোয়া রেজভীয়া, বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হাদায়িকে বখশিশ ছাড়া ও প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় যেমন, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান সহ অনেক নতুন নতুন মৌলিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ও রয়েছে তাঁর লিখিত ভান্ডারে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের অন্ততঃ পঞ্চাশটি শাখা-প্রশাখার নতুন নতুন তথ্য সম্বলিত এ দেড় হাজার গ্রন্থ লেখার কাজ তিনি এত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতেন যে- শুধু তাঁর লেখা ছাপাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো একটি পৃথক ছাপাখানাকে। বছরে গড়ে ত্রিশটি ছোটো বড়ো কিতাব রচনার মতো অকল্পনীয় কাজটিতে নিমগ্ন একজন ব্যক্তির পক্ষে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সময় না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বলে, সে শৈশব থেকেই বৃটিশ বিরোধী মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠা আহমদ রেযা খাঁন যে একেবারে রাজনীতির বাইরে ছিলেন তাও কিন্তু নয়। তিনি সে আল্লামা রেযা খাঁনের (১৮০৯-১৮৬৬) সুযোগ্য নীতি, যিনি একজন বড় ধর্মতত্ত্ববিধ ও বৃটিশ বিরোধী যোদ্ধা ছিলেন। ১৮৩৪ সনে জেনারেল বখ্‌ত খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। জেনারেল হার্ডসন যাঁর মস্তক ছিন্ন করতে তৎকালিন সময়ে পাঁচশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, রেজা আলী খাঁন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঘোড়া ও অস্ত্র দিয়ে ও সহযোগিতা দিতেন। (Neglected geniouns of he east: Dr. Mosood Ahmed, Pakistan)

আ'লা হযরত আহমদ রেযাও শৈশব থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী হিসেবে রাজনৈতিক ময়দানে অবদান রাখেন। তবে তাঁর রাজনীতি প্রত্যক্ষ ছিলো না। বৃটিশদের বিরুদ্ধে নিজে কলম সৈনিক হিসেবে এবং তাঁর শাহজাদা, ছাত্র, ভক্ত, অনুসারী ও খলিফাগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। এ সময় বৃটিশদের অবৈধ দখলদারিত্ব এবং বৃটিশদের অন্যতম সহযোগি ও মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হিন্দুদের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির গোমর ফাঁক করে তিনি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো হলো-

১. আনফাসুল ফিকরী কি কুরবানিল বাকরে (১৮৮০ খ্রী)

২. এলামুল এলাম বি আন্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম (১৮৮৮ খ্রী)

৩. তাদবীর ই ফালাহ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ (১৯২০ খ্রী)
৪. দাওয়ামুল আইশ ফী আইম্মাতি কুরাইশ (১৯২০ খ্রী)
৫. আল মোহাজাতুল মোতামেনা ফী আয়াতে মুমতাহিনা (১৯২১ খ্রী)

উক্ত গ্রন্থগুলো সদা অসতর্ক ও সহজ-সরল মুসলমানদের এখনো রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। আ'লা হযরত বৃটিশদের অবৈধ দখলদার হিসেবে গণ্য করতেন এবং তাদের প্রশাসনকে ও অবৈধ মনে করতেন। তিনি জনসাধারণকে বৃটিশ আদালতে বিচার প্রার্থী হতে নিষেধ করতেন। তাঁর মতে বৃটিশ আইন ও বিচার ব্যবস্থা শুধু ভ্রান্তই নয়, অধিকন্তু ব্যয় বহুল। এ বিচার ব্যবস্থা এদেশের বাদী-বিবাদী উভয়কে আর্থিকভাবে হয়রানি করে বিধায় অর্থনৈতিক কারণেও একে বয়কট করার পরামর্শ দেন। তিনি নিজেও কোনো দিন বৃটিশ আদালতের দারস্থ হননি। এমনকি তাঁর নিজের বিরুদ্ধে বৃটিশ কোর্টের দেওয়া সমনকে তিনি প্রত্যাখান করেন। ওয়ারেন্টজারী করেও বৃটিশ সরকার তাঁকে আদালতে হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। তিনি বৃটিশদের প্রতি ঘৃণার বহির্প্রকাশ স্বরূপ রাণীর ছবি সম্বলিত ডাক টিকেট লাগাতেন উল্টোভাবে। অর্থাৎ রাণী এলিজাবেথের মাথা থাকতো নীচের দিকে।

বৃটিশদের সাথে সাথে তিনি হিন্দুদের রাজনৈতিক চক্রান্তের ব্যাপারেও সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে আঁতাত করে এরাই একদিন মুসলমানদের ডুবিয়েছিলো এবং পরবর্তিতে বৃটিশদের সহযোগি হিসেবে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছে। এই দুই শক্তির জুলুম নির্যাতন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েই মুসলমানরা পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। অবশেষে প্রতিবাদী মুসলিমদের সংগ্রামকে ভিন্নখাতে ঠেলে দিতে এরা ১৮৮৫ সনে কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দল গঠন করে, যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিও ছিলেন একজন বৃটিশ। কংগ্রেস হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় মুসলমানদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহারের একটি কৌশল বলে প্রতীয়মান হবার কারণে, ১৯০৬ সনে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র সংগঠন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা পায়। আ'লা হযরত রাজনৈতিক ইতিহাসের এ ধারবাহিক সত্য উপাত্ত গুলোকে সামনে রেখেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। তা'ই তিনি বৃটিশ হঠানোর হিন্দু কৌশলে জড়িয়ে না পড়তে মুসলমানদের প্রতি বারবার আহবান জানান। তাঁর মতে এরা, উভয়েই আমাদের শত্রু হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হবে আমাদের রূপরেখা অনুসারে। কোরান-সুন্নাহ ও ইজতিহাদী দৃষ্ঠিভঙ্গিতে। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সরল। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এ প্রসঙ্গে ডঃ ইকবাল বলেছিলেন যে, তিনি (আহমদ রেযা) খুব চিন্তা-ভাবনা করেই মতামত দিতেন এবং সে কারণেই কখনো মত পাল্টানোর প্রয়োজন হতো না The Reformer of the Muslim world, By Dr. Masood Ahmed, Karachi, Pakistan)। ডঃ মাসউদ আহমদের মতে, আহমদ রেযা বেরলভী তখনো দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারক ছিলেন

যখন খোদ ডঃ ইকবাল ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নামক এক বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক চোরাবালির ফাঁদে আটক ছিলেন। আ'লা হযরতের এ তত্ত্ব বারবার প্রচারের দলে ডঃ ইকবাল ও জিন্নাহ্র রাজনৈতিক ধারণায় ও পরিবর্তন আসে এবং তাঁরা ও দ্বি-জাতি তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হন। আর এই দু'ই মহান নেতার হাতেই মূলতঃ ইমাম আহমদ রেযা'র রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে পাকিস্থান কায়েম হয়। অবশ্য এর জন্য অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে তাঁর ছেলে হামেদ রেযা খান সহ খলিফা, ছাত্র ও অনুসারীদের। তাঁরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী)'র সাথে এ আত্মঘাতি ঐক্যের কুফল তুলে ধরে আলাপ করেন। ১৯২০ সনে (১৩ রজব ১৩৩৯) বেরেলীতে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' আয়োজন করে এক জনসভা। এ জনসভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। এ সভায় ইমাম আহমদ রেযা খানের খলিফা মৌলানা সৈয়দ সুলায়মান আশরাফ, মৌলানা মুহাম্মদ জাফর উদ্দিন, মৌলানা বুরহানুল হক ও তাঁর বড় ছেলে মৌলানা হামেদ রেযা খাঁন আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ জনসভায়ও তাঁরা প্রকাশ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নামক হঠকারী রাজনৈতিক ধারণার বিরুদ্ধে আবুল কালাম আজাদের উপস্থিতিতেই বক্তব্য রাখেন। ডঃ ইকবালের পরামর্শে ১৯২০ সনে লাহোরের ইসলামিয়া কলেজ অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে উক্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ এবং আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সদস্য অধ্যাপক হাকিম আলী আ'লা হযরতের কাছে এ সংক্রান্ত একটি ফতোয়া তলব করেন। এ সময় আ'লা হযরত ভীষণ অসুস্থতার জন্য শয্যাশায়ী থাকা সত্ত্বেও 'আল মুহাজাল মুতামিনা' নামক ফতোয়াটি প্রকাশ করেন- যা স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গন্য হবে। এ ফতোয়াই মূলতঃ কবি ইকবাল ও জিন্নাহ সাহেবের ভ্রান্ত রাজনৈতিক ধারণায় পরিবর্তন আনে বলে মনে করা হয়। এ অনুপ্রেরণা থেকেই জিন্নাহ সাহেবের দ্বি-জাতিতত্ত্ব (Double nation theory), শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক'র লাহোর প্রস্তাব এবং পাকিস্থান আন্দোলন রূপলাভ করে। এ আন্দোলনে সমগ্র ভারত বর্ষব্যাপি আ'লা হযরতের মুসলিম অনুসারীরা সরাসরি অংশ নেন। বিশেষতঃ ১৯৪৬ সনে বেনারসে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক সম্মেলন থেকে এ আন্দোলন আরো তীব্রতা লাভ করে। সে সম্মেলনে নেতৃত্বদানকারী শিষ্য ও খলিফাদের মধ্যে মৌলানা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মুহাদ্দিস (ওফাত ১৯৬৩), মৌলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত ১৯৪৮), মৌলানা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আহমদ (১৯৬১), মৌলানা মুফতি মুহাম্মদ ওমর (১৯৫১) ও মৌলানা আবদুল হামিদ বদায়ুনী (১৯৭০) এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

অথচ এ সময় তথাকথিত ঐক্যবাদীদের সাথে থাকা বিভ্রান্ত দেওবন্দী মৌলভী মুসলমানদের এ গণদাবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ভারত শাসনের অধীনে থাকার আন্দোলন করে। বাংলাদেশ আন্দোলনের শীর্ষ স্থানীয় নেতা শেখ মুজিবরা

পর্যন্ত যখন' লরকে লেঙ্গে পাকিস্থান' শ্লোগান ধরছিল, তখন এরা বলেছিলো 'বন্দে মাতরম'। ১৯৪৭ এ পাকিস্থান কায়েম হয়েছিলো এবং সৌভাগ্য বশতঃ পূর্ববঙ্গ, পূর্বপাকিস্থান হয়ে এর অন্তর্ভূক্ত হয়। ফলে, ১৯৭১ এ মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে এ দেশ স্বাধীন বাংলাদেশ হতে পেরেছে। সেদিন কপাল দুঃখে এবং দেওবন্দী-ঐক্যবাদীদের সাথে একাত্ব হয়ে ভারতভুক্ত হলে স্বাধীনতা কী জিনিস তা কী আর বুঝতে পারতাম? কাশ্মীর ও অন্যান্য মুসলিম পরাধীন রাজ্য গুলোর দশাইতো হোতো আমাদের। ভারত থেকে এ পঞ্চাশ বছরে কেউ স্বাধীনতা পায়নি। ছত্রিশ ভাষাভাষির দেশ ভারতে হিন্দির দাপটই চলছে। স্বজাতির ভাষা-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাভাষি কলকাতার দশা আরো করুন। পাকিস্থানের অঙ্গরাজ্য থাকাকালীন আমরা বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই করেছি এবং মর্যাদা হাসিলও করেছি। এখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক মর্যাদা হয়েছে। যদি ভারতে থাকতাম তা যে সম্ভব হতো না তা তো কলকাতার অবস্থা দেখলেই বুঝা যায়। তারা কী বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে?

আজ অনেক পানি গড়ানোর পর এতোদিন আমরা যা বুঝে উঠছি তা শুরুতেই বুঝে নিয়েছিলেন আ'লা হযরত। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর আড়ালে লুকিয়ে থাকা দীর্ঘ রাজনৈতিক কূটচাল সম্পর্কে মুসলিম জনগণকে সজাগ করতে এতোটুকু দ্বিধা করেননি। তিনি বলেন, খেলাফত আন্দোলন মুসলমানদের আকর্ষণ করা স্বাভাবিক। অত্যন্ত আবেগ-উত্তেজনা প্রসূত এ আন্দোলনের অন্তরালের ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যটি তাই তিনি জনগণকে বুঝাতে চেয়েছেন। এক বছর পরেই ১৯২০ সনে এ আন্দোলন থেকে তারা সরে আসে এবং অসহযোগ আন্দোলনের নামে। আ'লা হযরত লিখেছেন, 'এ আন্দোলনের পেছনে মূলতঃ স্বরাজ আন্দোলনই এগিয়ে যাচ্ছে। আর 'স্বরাজ' মানেই তো হিন্দুরাজ। মুসলমানদের কতিপয় বিভ্রান্ত নেতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে হিন্দুরা স্বরাজ কায়েমের লক্ষ্যেই এ অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামের পবিত্রতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও তারা কর্মসূচি নিয়েছিলো। তাদের নেতা মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য হিন্দু নেতাদের মসজিদের মিম্বরে বসিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। মুসলিম নেতা ও মৌলভীরাও দুর্গা পূজা, কালিপূজাতে অংশগ্রহণ শুরু করেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নিদর্শন স্বরূপ। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের এমন ভাবাবেগ দেখে হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত গরু কোরবানী বন্ধ করার দাবী দিতেও ভুল করলোনা। আর একই সূরে ঠিক ঠিক বলতেও দ্বিধা করলেন না কতিপয় মৌলভী সাহেবান। অথচ, এ দাবী হিন্দুরা করতে পারে এ আশংকা আ'লা হযরত আগেই প্রকাশ করেছিলেন এবং গরু জবাইয়ের পক্ষে ১৮৮০ সনেই ফতোয়া দিয়ে দেন। তাঁর এ ফতোয়া'ই 'আনফাসুল ফিকরি কুরবানিল বকরী' গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, সম্রাট আকবরের সময় তাঁর হিন্দু প্রীতির কারণে গরু জবাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। হযরত মুজাদ্দিদ আল ফিসানী (রহঃ)'র আন্দোলনের ফলে সম্রাট জাহাঙ্গীর এ নিষেধাজ্ঞা তুলে

নেওয়ার ঘোষণা দেন। (Tazaki-I-Jahangiri,Lahore, 1906-BP-696).' ।

১৮৫৭ সনের সংগ্রামের পর দুর্বল হয়ে পড়া মুসলিম সমাজের অবস্থা বুঝে হিন্দুরা পুনরায় গরু জবাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবী শুরু করে দেয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পূর্বে ১৮৮০ সনে আ'লা হযরত'র কাছে এ বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করা হলে তিনি জবাইয়ের পক্ষে উক্ত ফতোয়া প্রদান করেন। তিনি লিখেন যে, হিন্দুদের তুষ্ট করার জন্য গরু জবাই বন্ধ করা সঠিক কাজ হবে না। (পৃ-৯)। অথচ, একই সময়ে একই বিষয়ে মৌলভী আবদুল হাই লক্ষৌভি ফতোয়া দেন যে, গরু জবাই ওয়াজিব নয়, সুতরাং কেউ বন্ধ করলে গুহানাহ্ হবে না'। (The Reformer of Muslim world, P-91) । অবশ্য, পরে তিনি তাঁর ভুল এবং হিন্দুদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হন এবং ফতোয়া সংশোধন করে আ'লা হযরতের সাথে একমত হয়ে বলেন, 'গরু জবাই করা মুসলমানদের একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত আমল সুতরাং এটা বন্ধ করা যাবেনা' (আবদুল হাই, মজ্‌মুয়ায়ে ফতোয়া, খন্ড-০৩)। আ'লা হযরত এ প্রসঙ্গে একবার বলেন যে, 'মৌলভী সাহেব হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। অথচ একই বিষয় আমার কাছেও এসেছিলো। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবাণী আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে 'বিড়াল প্রথম দিনেই মারতে হবে'। আমি এ জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি।" (আল মালফুজ, খন্ড ১, পৃ - ১৬)

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, আ'লা হযরত যখন এ সঠিক ফতোয়াটি দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র তেইশ। এটা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, এ ক্ষেত্রে আহমদ রেযার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক দিক নির্দেশক ছিলো। ১৯১৯ সনে খিলাফত আন্দোলনের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য মঞ্চ থেকেই গরু জবাই নিষেধাজ্ঞার দাবী উঠেছিলো। আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, কংগ্রেস সভাপতি পন্ডিত মদন মোহন মালভীয়া এবং মুসলিম লীগ সভাপতি হাকিম আজমল খান ও এ দাবী প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন (সোলায়মান আশরাফ বিহারী; আল নূর, আলিগড় ১৯২১, পৃ-১১-১২)

আ'লা হযরতের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অপর এক নিদর্শন হলো তাঁর অপর এক ফতোয়া 'আ'লাম আল্ আ'লাম'। তিনি এ ফতোয়ার মাধ্যমে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত মুসলিম রাজনীতিবিদদের সতর্ক করে বলেন যে, অবিভক্ত ভারত বর্ষে মুসলমানদের অধিকার রয়েছে। মুসলমানরা সফলতার সাথে হাজার বছর শাসন করেছে এদেশ। সুতরাং এ অধিকার কোন ক্রমেই ছেড়ে দেওয়া যায়না। বৃটিশ-হিন্দুরা এ অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলো। সুতরাং এ রাজ্য উদ্ধার করতে হবে আমাদের স্বতন্ত্র পরিকল্পনায়। শত্রুদের সাথে নিয়ে নয়। আর এ জন্য তিনি, উক্ত ফতোয়ায় তাঁর কাছে বদায়ুনের মীর্জা আলী রেজা'র পক্ষে আসা এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত বর্ষকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা করেন এবং এর কারণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা

করেন। তিনি 'দারুল হরব' ঘোষণাকারীদের সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতি এবং হিন্দুদের স্বার্থে মনে করতেন- যা মুসলমানদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটাতে পারে। তিনি একদিকে কোরান-সুন্নাহ এবং ইমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ)'র মতামত আর অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণ তুলে ধরে দেখান যে, 'দারুল হরব' ঘোষণার পর মুসলমানদের দেশ থেকে হিজরত করা ফরজ হয়ে যায়। আর ভারত বর্ষ থেকে মুসলমানরা হিজরত করতে যাওয়া মানেই তো হিন্দুদের হাতে দেশ ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া। ফলে মুসলমানদের আর ভারত ফিরে পাবার অধিকারও বহাল থাকবেনা। যা মুসলমানদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটানোর হিন্দু কৌশল মাত্র। তিনি ভারতকে দারুল ইসলাম ঘোষণার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন-' আমাদের ইমামে আজম' এবং ওলামায়ে সালাসা'র মতানুসারে হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম। কারণ, ইমামে আজম (রাঃ) 'দারুল হরব' হবার জন্য তিনটি শর্ত দিয়েছেন, এর একটি হল শির্ক আইন অতিমাত্রায় চালু থাকা এবং শরিয়ত সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ থাকা। আল্লাহর প্রশংসা যে, এ শর্তটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে না।' (পৃ-২-৮)

অবশ্য, আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভি এবং আশরাফ আলী থানবী সাহেবও অবিভক্ত ভারতকে দারুল ইসলাম ফতোয়া দিয়েছিলেন। অথচ তাদেরই অনুসারীদের কতিপয় মৌলভী দারুল হরব এবং এর সুফল হিসেবে 'সুদন গ্রহণ' কে হালাল বলে ফতোয়া দেয়। উল্লেখ্য, দারুল হরব -এ সুদ গ্রহণ' করা জায়েজ এবং দেশত্যাগ (হিজরত) ফরজ। আ'লা হযরত তাদের হীন উদ্দেশ্যের সমালোচনা করে বলেন, 'এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, যেখানে সুদ'র বিরুদ্ধে কোরানে করীমের অনেকগুলো আয়াত এবং নিন্দাবাদ রয়েছে সেখানে দারুল হরব ঘোষণা দিয়ে তারা সুদকে হালাল করে নিচ্ছে। তাদের দেশ ছাড়ার ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তা তারা করছেনা। এ দেশটি তাদের কাছে দারুল হরব হয়ে গেছে শুধুমাত্র সুদ গ্রহণ ও আরাম-আয়েশে দেশে বসবাসের সুবিধার জন্য।" (পৃ-৭)

প্রকৃত অর্থে ভারত বর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা কারীদের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হলে মুসলমানদের ভারত ত্যাগ করতে হতো বিধায় বৃটিশদের বিরুদ্ধে আর স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে তোলা যেতোনা এবং হিন্দুদের জন্য বিনা প্রতিরোধে 'স্বরাজ' কায়েমের সুযোগ এসে যেতো। আল্লাহ আমাদেরকে এ চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আ'লা হযরত এ প্রসঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, বৃটিশ রাজত্ব দারুল হরব' হলে হিন্দু রাজত্ব কী হবে? ১৯১৯ সনে সমগ্র ভারত ব্যাপি খেলাফত আন্দোলন শুরু হলে হিন্দুদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা গান্ধী সাহেব অনাকাঙ্খিতভাবে এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি এ খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন এবং মুসলমানদের অন্তর দখল করে নেন। ১৯২০ সনে তিনি হঠাৎ করে শুরু করে দেন অসহযোগ আন্দোলন। এবং হুজুগে মুসলমানদের সমর্থনকে অন্য দিকে প্রবাহিত করেন। এখন তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন। যা কংগ্রেসকে নতুন জীবন দান করে এবং মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে পিছিয়ে দেয়।

আ'লা হযরত তুর্কিদের সহযোগিতায় ভিন্ন পথ দেখিয়েছিলেন বটে, এ খেলাফত আন্দোলন নামক হটকারী রাজনীতিকেও সমর্থন করেননি। উপরোক্ত রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির গন্ধ পাওয়া ছাড়াও আরো কিছু যুক্তিযুক্ত কারণে তিনি তুর্কি মুসলমানদের পক্ষ প্রদর্শন করা এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে পারেন নি। কারণ, ১. এ ঘটনা ছিলো তাঁর ইন্তেকালের অব্যবহিত আগের এবং তিনি খুব অসুস্থাবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ২. তুর্কি সালতানাতকে খেলাফত বলা প্রশ্নে তিনি অন্যদের সাথে ফিক্‌হী দৃষ্টিতে দ্বিমত পোষণ করতেন। ৪. তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কিছু অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা এর মাধ্যমে সরল প্রাণ মুসলিম নেতাদের প্রতারণা করছেন। এ আন্দোলনের মোটিভ প্রকাশ্যে যা বলা হচ্ছে বাস্তবে সে রূপ ছিলো না। এর আসল উদ্দেশ্য ছিলো স্বরাজ অর্জনের পথে মুসলমানদের উৎসর্গ করা। ৫. তাছাড়া তুর্কিদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কর্মসূচি ছিলো।

এ সময় আ'লা হযরত প্রকৃত অর্থে শেষ বিছানায় শায়িত ছিলেন। এরপরও ছিলো সালাতানাত ও খেলাফত সংক্রান্ত দ্বিমত। তিনি বলেন, 'শুধু ওসমানি সালতানাত কেনো বরং প্রত্যেক ইসলামি সালতানাতে, শুধু প্রত্যেক সালতানাত কেনো এবং প্রত্যেক মুসলিম জনগোষ্ঠী, এমনকি ইসলামের অনুসারি কোন ব্যক্তি যদি সাহায্য চায়, তবে তাকে সাহায্য করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে কুরাইশি হতে হবে না। (আহমদ রেযা, দাওয়াম আল আইশ, পৃ-১৪)

সাথে সাথে তিনি আরো বলেন যে, কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতানুসারে খেলাফত ই শরিয়া'র জন্য কুরাইশি হওয়া আবশ্যক। অবশ্য, সব কুরাইশি রাজাকে খলিফা বা 'আমির উল মুমেনিন' বলা যাবেনা, একমাত্র তাদের বলা যাবে যাঁরা সাতটি শর্ত পূরণ করেন। এগুলো হলো- মুসলিম, বুদ্ধিমান, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন পুরুষ, যোগ্য এবং কুরাইশ বংশীয় হওয়া। (পৃ-১৪-১৫)

এরপর তিনি খেলাফত ও সালতানাত' এর পার্থক্য সুস্পষ্ট করে বলেন-

১) তাঁর আইন এবং শাসনে, একজন খলিফা সত্যিকার ভাবে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত এবং উম্মাহর অভিভাবক।

২) গুনাহর বিষয় ছাড়া, অন্য সব ক্ষেত্রে খলিফার প্রতি আনুগত্য উম্মাহর জন্য ফরজ। তাঁর মর্যাদা দৃশ্যত এই ক্ষেত্রে।

৩) খলিফার সকল আইনগত নির্দেশ ফরজ এবং নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকা হারাম।

৪) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সুলতান একাধিক হতে পারেন কিন্তু খলিফা হবেন একজন।

৫) কোনো সুলতান তাঁর রাজ্য সীমানায় অন্য কোনো সুলতানের নির্দেশ মানতে বাধ্য নন, কিন্তু প্রত্যেক সুলতানকেই খলিফার নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়।

৬) কোনো বৈধ ধর্মীয় কারণ ছাড়া সর্বাপেক্ষা বড় সুলতান ও খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারে না।

৭) সালতানাতের জন্য কুরাইশি হবার কথা অপ্রয়োজন, এমনকি স্বাধীন হওয়ারও প্রয়োজন নেই। ক্রীতদাসরাও রাজা বা সুলতান হতে পারেন। (পৃ-২৫-২৭) সূত্র ঃ The Reformer of Muslim world.

উপরোক্ত তথ্যাদি ছাড়াও তিনি নবীজির (দঃ) হাদিস সাহাবা-তাবেয়ী (রাঃ)'দের মতামত, এজমা ও আহলে সুন্নাত'র মতামত পেশ করে দেখান যে, খলিফা হবার জন্য কুরাইশি হওয়া পূর্বশর্ত। তিনি পঞ্চাশটি হাদীস সহ মোট নব্বইটি উদ্বৃতি দিয়ে তাঁর দাবীর পক্ষে দলিল পেশ করেন।

খেলাফতের জন্য কুরাইশি হবার শর্ত নিয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও আবদুল বারী ফারাংগী মাহারী'র সঙ্গে আইনি মত পার্থক্য ছাড়াও অন্য যে কারণে আ'লা হযরত এ খেলাফত আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন তা হলো- হিন্দুদের গোপন উদ্দেশ্য। তিনি ইসলামের নামে চলমান এ আন্দোলনের উপর ভর করে কীভাবে হিন্দু সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটছিল তা তুলে ধরে বলেন,

'এ আন্দোলনকে দেখানো হচ্ছিল যে পবিত্র খেলাফত রক্ষার প্রয়োজন হিসেবে, ফলে মুসলমানরা দোষের কিছু না দেখারই কথা। অথচ, এ বাহ্যিক পোশাকের আড়ালে মূলতঃ ধর্ম বিরোধী ঐক্য, মুশরিকদের নেতৃত্ব ও তাদের দাসত্বকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পাথর পূজার কাছে কোরআন এবং হাদীস উৎসর্গ করা হচ্ছে। মুসলমানদের কপালে চুনকালি, আর কাফেরদের অভিনন্দন করা হচ্ছে। মুসলমানরা রামায়ন পূজায় যোগ দিচ্ছে। মুসলিম সৈন্যদের জন্য মুশরিকদের চিতার সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ হচ্ছে, কাফির মন্ত্র পাঠ করছে। কাফির'রা মসজিদে ধর্মোপদেশ দিচ্ছে। হিন্দুদের সন্তুষ্টির জন্য গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করণ হচ্ছে। তারা এমন এক ধর্মমত খুঁজছে যেখানে ইসলাম ও কুফরের দূরত্ব মুছে যাবে। কোন মুসলিম এর সাথে একমত হতে পারে?" [Monthly al-RIZA, Dhil Hijja, 1338 (1920) P : 5-6]

তিনি ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, 'আল্লাহর আইন-নির্দেশ পরিবর্তন করে শয়তানের পথ অবলম্বনকে প্রতিহত করুন। মুশরিকদের সাথে ঐক্য ভেঙ্গে দিন, মুরতাদদের সংগ ত্যাগ করুন। আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদেরকে তাঁর জিম্মায় নিয়ে নিবেন। দুনিয়া না পেলেও আখেরাত আপনি পেতে পারেন'। (Ra'is Ahmed Jafary : Auraq-i-Gamsashta, Lahore, 1968. P-305)

আ'লা হযরত হিন্দু সংস্কৃতির উন্নয়নের এবং ইসলামের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হবার ব্যাপারে যে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন তা প্রমাণিত হতে খুব বেশি দেরি হলো না। খিলাফত কমিটি (১৯১৯) মিস্টার গান্ধীকে সভাপতি করে অন্যান্য হিন্দুদের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় পদে আসীন করার পর হিন্দুদের জন্য পর্যন্ত মসজিদে দোয়া ফাতেহা আরম্ভ হয়ে যায়। মুসলমানরা গান্ধীর অনুগত হয়ে পড়ে। যা তাঁর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য স্বরাজ অর্জনের জন্য দরকার হয়ে পড়েছিলো। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের গান্ধী নির্ভরতা মূলতঃ আন্তর্জাতিক ভাবে ইসলামের পরাজয় এবং

গান্ধীর ধর্ম দর্শনের বিজয় প্রমাণিত হচ্ছিল। এ জন্য তিনি আব্দুল বারী ফারাংগীকে লক্ষ্য করে বলেন,

'By your Support the system of Ghandi's religion is established"

(The reformer of the muslim world; Dr. Masud Ahmad, P-110)

আ'লা হযরতের উক্ত উক্তি অবশ্য কিছু দিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে যায়। Lous Massignon নামক ফ্রান্সের এক ৩৭ বছরের তরুণ অধ্যাপক সে সময় খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ ছিলেন। সৈয়দ সুলায়মান নদভী প্যারিসে গিয়ে তাঁর সাথে খেলাফত আন্দোলনের বিষয়ে আলাপ করেন। এ তরুণ বিদেশী প্রফেসর সুলায়মান সাহেবকে গান্ধীর প্রতি বেশ প্রভাবিত দেখতে পান এবং মনে করেন যে, গান্ধী মুসলিমদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। এরপর প্রফেসর লিখেন যে,

'For Perhaps the first time in human history a man had arisen who had influence on people of othre religions with constructive social results' (Guilis Basetti-Sani : Prophet of other Religious Reconci liation, Chicago.)

শুধু তাই নয়, মুসলিম ওলামা ও নেতৃবৃন্দের গান্ধী প্রীতি'তে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি আরো বলেন যে, 'He was the last of the Saints" (P-215) অর্থাৎ তিনি (গান্ধী) সর্বশেষ সিদ্ধ পুরুষ (ইমাম)।

সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আহমদ রেযা (রহ.)'র রাজনৈতিক অবস্থানের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তিনি বৃটিশ বিরোধীতার আড়ালে হিন্দুত্বকে বরণ করে নেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন বলেই এ আন্দোলনে অংশ নেননি। অন্যথায় তিনি তুর্কি মুসলমানদের সাহায্যের পক্ষেই ছিলেন এবং তাঁর লিখিত অপর গ্রন্থ 'তদবীর এ ফালাহ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্' (১৯১৩) তে তাদের প্রতি সাহায্যের ধরণও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে ভারত বর্ষের মুসলমানদের যে করুণ পরিস্থিতি বিরাজমান এ অবস্থায় তাদের ক্ষমতা নেই যে দেশ ত্যাগ করে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী দেশ তুরস্কে গিয়ে যুদ্ধ করার। বরং আমরা তাদের জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য করবো। (তদবীর এ ফালাহ ঃ ৭-৪)

উল্লেখ্য ১৯১৭ সনের দিকে, আ'লা হযরত অনুসারীরা বেরেলীতে 'জামাতে রেজায়ে মুস্তফা' নামক একটি সংগঠনের মাধ্যমেও সে সময়ের হুজুগ থেকে মুসলামনদের বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। তাঁরা খেলাফত আন্দোলনের সময় 'আনসারুল ইসলাম' নামে আরো একটি সংগঠন স্থাপন করেছিলেন। এ সংগঠনের উদ্যোগে আ'লা হযরত'র রাজনৈতিক দর্শনকে প্রচারের জন্য অনেক সম্মেলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আ'লা হযরতের ছেলে, খলিফাবৃন্দ এবং বন্ধুরা এতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখতেন। 'আনসার উল ইসলাম' গঠনের উদ্দেশ্য ছিলো- ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলো হেফাজত করা, তুর্কী জনগণ এবং তাদের

সরকারকে যথাযথ সাহায্য প্রদান, মুসলমান ও ইসলামকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা এবং মুসলমাদের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করা।

১৯২০ সনে, অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে এবং এবং এর ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দাবী তুঙ্গে উঠলে (আ'লা হযরত) মিল্লাত হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্তার হেফাজতের প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং মৃত্যু বিছানায় বসে 'আল মুহাজ্জা আল মূ'তামিনা ফি আয়াত আল মূমতাহিনা (১৯২০) গ্রন্থটি লিখতে বাধ্য হন। তখন তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে মৌলানা জাফর উদ্দিন রিজভীকে লিখেছেন- ১২ রবিউল আউয়াল ১৩৩৯ (১৯৩০খ্রী) হতে আমার শারীরিক অসুস্থতার এমন অবনতি হয় যে যা ইতোপূর্বে হয়নি। কোন কোন সময় ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত আমি মূত্রত্যাগ করতে পারিনি। এই অবস্থায় আমি অন্যজনকে দিয়ে লিখাতাম। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে শরীর সুস্থ হয়ে উঠলো। আজ দু'মাস পরও দুর্বলতা রয়ে গেছে। চারজন লোক আমাকে চেয়ারে করে মসজিদে নিয়ে যায়। আর এ অবস্থায় আমাকে অসহযোগ আন্দোলন এবং বিধর্মীদের মসজিদে প্রবেশের বিরুদ্ধে লিখতে হলো। ..... প্রবন্ধের ছাপার কাছ চলছে।' (হায়াত-ই-আ'লা হযরত, ১ম খন্ড পৃ- ২৯৮)

উক্ত গ্রন্থটি মূলত দু'টি প্রশ্নের জবাবে লেখা হয়েছিল। ১৯২০ সনে লাহোর ও লায়লপুর (ফয়সালাবাদ) থেকে এ প্রশ্নদ্বয় এসেছিলো। প্রথম প্রশ্নটি করেন লাহোর ইসলামিয়া কলেজের গণিতের অধ্যাপক হাকিম আলী। ফয়সালাবাদ ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চৌধুরী আজিজুর রহমান ১২ রবিউল আউয়াল ১৩৩৯ হিজরীতে অপর প্রশ্নটি করেছিলেন। প্রথমটির উত্তর দেওয়া হয় সংক্ষেপে যথাযথভাবে। পরেরটি দেওয়া হয় বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে। উক্ত ফতোয়া দু'টিই বেরেলীর হোসাইনী প্রেস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি জিম্মি, হারাবি ও মুসতা'মান'দের সাথে সহযোগিতা এবং অসহযোগিতার ধরণ কেমন হবে তাও বর্ণনা করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি সহযোগিতার তিনটি অবস্থার কথা বলেন-

১. 'ইলতিজা' বা আবেদন

২. ই'তিমাদ' বা বিশ্বাস (প্রত্যয়)

৩. ইসতিখাদাম বা গোলামী।

* প্রথমটি আমাদের সংখ্যালঘু হবার ক্ষেত্রে; যদি আমরা সংখ্যা গুরুদের আশ্রয় প্রার্থনা করি- (আমাদের সুবিধার জন্য), এটা পরিস্কারভাবে আমাদের আত্মসমর্পনের শামিল হবে।

* দ্বিতীয় অবস্থা হলো প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্ক রাখা। প্রত্যয় হলো তাদের সাথে সমান তালে বা পদক্ষেপে চলার সম্পর্ক। এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা এবং বন্ধুত্ব চাওয়ার উদ্দেশ্য হবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান এবং সফলতার জন্য। আমাদেরকে তাদের দয়ার কাছে সমর্পন নয়। তাদের সহানুভূতি এবং সদিচ্ছার প্রতি আমাদের

বিশ্বাস থাকবে। তবে, কোনো যথার্থ মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি তার শত্রুকে সমর্থক মনে করবেনা।

* গোলামী' হলো অমুসলিমদের আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। তার সে কুফরি বিশ্বাসের কারণে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে চাইলেও অসহায় হওয়ার কারণে কিছু করতে অক্ষম হবে।

(রইস আহমদ জাফরী) ঃ আওরক ই গুমগাশতা, লাহোর, ১৯৬৮, পৃঃ ২৭৯, Ref. আল মুহাজ্জা..) সম্পর্ক সহযোগিতার উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো বর্ণনার পর তিনি এ ব্যাপারে তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট মতামত দিয়ে বলেন যে,

"কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক হারাম। যদিও সে জিম্মি বা ইসলামের প্রতি অনুগত বা সে কারো পিতা, পুত্র, ভাই বা বন্ধু।" (পৃ-২৮০)

এ প্রসঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি আব্দুল বারী ফারাংগী মাহালী'র সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আমাদের ধর্মীয় কাজে তাদের অংশগ্রহণ পরিস্কার ভাবে নিষিদ্ধ। অথচ তিনি নিজেকে তাদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর নেতা বানিয়েছেন। তিনি পরিস্কারবাবে লিখেছেন যে, তিনি তাদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তাঁর অবস্থা হলো এই দুই লাইন কবিতার মতো 'উমরে কী বা আয়াত ওয়া হাদীস গুজাশ্‌ত- রাফ্‌তি ওয়া নিসারে বুত পারাস্ তে কার্‌দি' (পৃষ্টা ঃ ২৮৫)

অর্থাৎ 'আমার যে জীবন কোরান-হাদীসের শিক্ষাদানে কেটেছিল, তা (আজ) মুর্তিপূজায় উৎসর্গ করলাম'।

আহমদ রেযা (রহঃ) মনে করতেন, হিন্দুদের সাথে সাহায্য- সহযোগিতা ক্ষতিকর, কারণ এরা ভারতে মুসলমানদের সাথে ধর্মীয় সংঘাতে জড়িত। তিনি বলেন, 'গান্ধী সাহেব যিনি হিন্দুদের রাজা, শুধু হিন্দুদের নয় বরং তোমরা প্রোহিন্দু'দেরও, স্পষ্ট করে বলেনি যে, মুসলমানরা গরু জবাই বন্ধ না করলে আমরা তা তরবারীর জোরে বন্ধ করবো।" (পৃ-২৫০)

অর্থাৎ গান্ধী সাহেবের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এ সংকল্পটি প্রকাশ করছেন না এ ভয়ে যে অচেতন মুসলমানদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। এ হুজুগ তখন আর থাকবেনা। সমর্থন প্রত্যাখান হবে এজন্য। আর এ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটিই আ'লা হযরত মুসলমানদের বুঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি শত্রুদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে বলেন, একজন শত্রু তার প্রতিপক্ষের তিনটি ক্ষতি আশা করে।

১. তার সমস্থ আশা যেনো পূর্ণ হয়ে যায় এ জন্য প্রতিপক্ষের মৃত্যু (হোক)।

২. যদি তা সম্ভব না হয় তবে, চাইবে যেনো সে নির্বাসিত হয় যাতে তার সমস্ত বাধা অপসারিত হয়।

৩. যদি এটাও সম্ভব না হয়, তবে তাকে শক্তিহীন বা অসহায় করে দেওয়া। আর বিরোধী পক্ষ মুসলিমদের উক্ত তিন প্রকারের ক্ষতি সাধনের সব আয়োজন মুসলমানদের হাতে নিয়েই সম্পন্ন করেছিল সে সময় তারা। ১) যে জিহাদের ডাক দিয়েছিলো তা ছিলো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ধ্বংসাত্মক, মৃত্যুর দিকে ঠেলে

দেওয়া। ২) এটা না ঘটলেও, (দারুর হরব ঘোষণার কারণে) তাদের হিজরত তথা নির্বাসিত হবার উৎসাহ দেওয়া হয়েছিলো, যাতে তারা (মুসলমানরা) মাতৃভূমি এবং জায়গা সম্পত্তি পরিত্যাগ করে পলায়ন করে। ৩) যখন এ উদ্যোগও সফল হলো না, তখন তারা অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) শুরু করে দিল, যাতে মুসলমারা তাদের চাকরি-বাকরি ছেড়ে দেয়, জাতীয় পরিষদের সিটগুলো ছেড়ে দেয়। মুসলমানদের বলা হয়েছিল কর (Tax) না দেওয়ার জন্য। তাদের সকল উপাধি বা খেতাব ফেরৎ দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। যাতে মুসলমাদের চাকরি, আসন এবং অন্যান্য যা সামান্য কিছু ছিলো তাও হিন্দুদের দখলে চলে যায়।

মূলতঃ আ'লা হযরত মুসলমানদের জন্য ইতিহাস ও কোরআন সুন্নাহর আলোকে একটি স্থায়ী এবং গতিশীল রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলো। তিনি চেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পরামর্শ পরিকল্পনা নিজেদের মধ্যে নিজেদের নির্ভুল ধর্মীয় আদর্শের অনুসরণেই করবে। ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ও নেতৃত্ব আমাদেরকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। এরা আমাদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আমাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য নয়। বরং আমাদের স্বার্থের উন্নয়ন দেখলে এরা ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়ে এবং প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা করে দেখে। আ'লা হযরতের এ ধারণা আমরা ভারত বর্ষের রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ্য করেছি। এরা বৃটিশদের পদলেহন করে শত শত বছর আমাদেরকে তাদের দাস ও প্রজা বানিয়ে রেখেছিল। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাবে এরাই ভারতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বসে বাধা দিয়েছিলো। এ বাংলার মুসলমানদের পক্ষে গৃহীত 'বঙ্গভঙ্গ' সিদ্ধান্তকে এরা সন্ত্রাসী প্রতিরোধে উড়িয়ে দিয়েছিলো। 'বঙ্গভঙ্গ রদ' এর ফলে মর্মাহত বাঙ্গালি মুসলমানদের জন্য ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তেও এরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো প্রতিবাদ সভা। অবশেষে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে একে 'মক্কা ইউনিভার্সিটি' বলে তির্যক মন্তব্য ছুঁড়েছিলো। এদের দেওয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এবং এদের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনীতিকে কীভাবে আ'লা হযরতের মতো একজন মহান সংস্কারকের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব?

তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সকল নিন্দাবাদ উপেক্ষা করে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে একের পর এক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখে তাঁর এ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেন। তিনি মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণেরও আহবান জানান। তিনি মনে করতেন অর্থনীতি ও রাজনীতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য; একই বিভাগের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুসলমানদের শান্তি ও মুক্তির জন্য অবশ্যই এ উভয় ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। অবশেষে তিনি 'তদবীর এ ফালাহ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ' নামক গ্রন্থটিতে ভারতের মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেন।

প্রস্তাব গুলো হলো ঃ

১. সরকারী হস্তক্ষেপের ব্যাপার আছে এমন কতিপয় সীমিত বিষয় ছাড়া অপর সব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমাদের হাতে নিতে হবে এবং আমাদের সমস্যা আমাদের মধ্যেই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। কোটি কোটি টাকা (বৃটিশ আদালতের) ষ্ট্যাম্প এবং আইনজীবির ফি বাবত নষ্ট হচ্ছে যা আজ অনেক পরিবারকে অচল করে দিয়েছে এবং দিতে যাচ্ছে। (পৃ-৫)

২. আমাদের কোন সামগ্রী মুসলিম ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কেনা উচিত হবে না যাতে করে আমাদের টাকা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে আমাদের প্রয়োজনের জন্য অন্য কারো উপর নির্ভরশীল হতে না হয়। আমেরিকা এবং ইউরোপ আমাদের কাছ থেকে সস্তায় (কাঁচামাল) কিনে নিয়ে তৈরী জিনিস চড়া দামে বিক্রি করে। (পৃ-৫-৬)

৩. বোম্বাই, কলিকাতা, রেংঙ্গুন এবং মাদ্রাজের ধনী মুসলমানদের চেষ্টা করা উচিত যেনো 'মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। মুনাফা অর্জন করার শত রকমের উপায় রয়েছে, যা (তাঁর) বই 'কিফ্লাল ফকীহ্ আল ফাহীম' এ উল্লেখিত হয়েছে। (পৃ-৬)

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, আমাদের ধর্মের রশি মজবুত করে ধরতে হবে। এর মাধ্যমে আমাদের পূর্ব পুরুষরা উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌছে গিয়েছিলেন এবং অন্যান্য সকলের হৃদয়ে এজন্য তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গরীব মানুষেরা সিংহাসনে আরোহন করেছিলো। আর যারা এ ধর্মের লাগাম ছেড়ে দিয়েছিল তারাই অসম্মানের ভাগী হয়েছিল। (পৃঃ ৬) (সুত্র ঃ The Reformer of the Muslim world)

আ'লা হযরত উপরোক্ত তাৎক্ষণিক করণীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রদানের সাথে সাথে তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলমানদের ক্ষীয়মান মানসিকতার একটি চিত্র ও তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

১. কাংক্ষিত অভিপ্রায় অনুসারে আপত্তির নিষ্পত্তি না হলে তা তারা (মুসলমানরা) প্রত্যাখ্যান করে আদালতের শরণাপন্ন হয় এবং কোর্টের রায় ঠিকই মেনে নেয় যদিও ঐ রায়ের ফলে তাদের ভিটে বাড়ি ও হারাতে হয়। (পৃ ঃ ৭)

২. মুসলমানদের মধ্যে যারা একটু সামাজিক মর্যাদা সচেতন তারা আবার ব্যবসা বাণিজ্য'র পরিবর্তে চাকুরি পছন্দ করে এবং অবৈধভাবে রোজগারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। তারা ব্যবসার ক্ষেত্র ও ব্যবসায়িক কৌশল অর্জন করতে জানাছে না। মুনাফার পরিমাণ হতে হবে কম কিন্তু ব্যবসার পরিমাণ হতে হবে বেশি। একজন মুসলিম ব্যবসায়ী চায়, সব মুনাফা একজন ক্রেতার নিকট থেকে হাতিয়ে নিতে। আর বাধ্য হয়েই সে ক্রেতা হিন্দু ব্যবসায়ীদের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে।

৩. আমাদের ধনাঢ্য মুসলমানরা তাদের বিলাসিতায় সুখ পান। তারা অর্থনৈতিক কাজে হাজার হাজার টাকা খরচ করে অথচ তাঁর অপর এক অভাবী ভাইকে সাহায্য করে না। (পৃঃ ৮)

৪. আমরা বিশ্বাস করি, এন্ট্রান্স পাশ করলেই বুঝি জীবিকার নিশ্চয়তা পাওয়া গেলো। আমরা চাকুরির সকল শর্ত পালন করতে প্রস্তুত, অথচ ধর্মের ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। (পৃঃ৮)

মুসলমানদের আর্থ সমাজিক এ অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে আ'লা হযরত মুসলমানদের স্থায়ী উন্নয়নের জন্য কীরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে সেদিকে ও ইঙ্গিত করেন। তিনি প্রচলিত বৃটিশ শিক্ষানীতির কট্টর সমালোচক ছিলেন। এবং কোরান-সুন্নাহর সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাপেক্ষে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তাঁর এ চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় সফলতা হলো মুসলিম ভারতের দুই প্রধান নেতার মধ্যে এর প্রভাব পড়া। এ জন্য এ দুই নেতা অসহযোগ আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন এবং সুযোগ-সময় মতো আ'লা হযরতের রাজনৈতিক দর্শনকে সামনে নিয়ে আসেন। ১৯৪০ সন ছিলো সে উপযুক্ত সময় যখন সমগ্র ভারত ব্যাপি স্বাধীনতার প্রকৃত ও সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু হয়ে যায় যা ১৯৪৭ এ সফলতার মুখ দেখে। যদিও এসময় এ রাজনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম রূপকার আ'লা হযরত আর এ জগতে ছিলেন না। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সে হুজুগে সময়েই ১৯২১ সনের ২৭ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।

যে আল্লামা ইকবাল আ'লা হযরতের ফতোয়ায়ে রেজভিয়া পড়ে 'তাঁকে যুগের আবু হানিফা' (মক্বালাত ই ইয়াওমে রেযা ঃ ৩য় খন্ড লাহোরে ১৯৭১) বলে মন্তব্য করলেন সে তিনিই ছিলেন এক সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যর এক বড় নেতা। এ সময় ১৯১৬ সনে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে জিন্নাহ সাহেবের ঘোষণা ছিলো, 'I could not tolerate the Communal differences in any form' আর তাঁর এমন 'ঐক্য' বিশ্বাস দেখে Mr . Gokhil বলেন, 'One day he would become the great standard-bearer of Hindu Muslim Unity' (Khuba Bakhsh Azhar, Muslim league, Lahore, 1940, P:14)

আর এমন হিন্দু মুসলিম ঐক্য পক্ষীয় আবহাওয়ার বিরুদ্ধে গিয়েই আ'লা হযরত মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ডাক দেন। আর এ মিশনেই তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত হয়। পরবর্তিতে জিন্নাহ সাহেবের ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর মিশনের সফলতা আসে।

কিছু রাজনৈতিক ও জাতীয় ব্যক্তিত্ব এ সময় মনে করতেন যে বৃটিশরা মুসলমানদের শুভাকাঙ্খী এবং হিন্দুরা বিরুদ্ধবাদী। আর কিছু ব্যক্তির ধারণা ছিলো যে হিন্দুরা সমর্থন যোগ্য তবে বৃটিশরা নয়। আর আ'লা হযরত এদের উভয় ধারণাকেই ভুল মনে করতেন এবং উভয় সম্প্রদায়কে মুসলিম বিদ্বেষী বলে উল্লেখ করেন। বৃটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব সম্পর্কে আরো একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৮৯৩ সনে, 'নদওয়াতুল ওলামা' গঠিত হলে এর গঠনতন্ত্রে বৃটিশদের প্রতি সমর্থন ও প্রশংসা স্থান পেলে আ'লা হযরত বিক্ষেভে ফেটে পড়েন

এবং তাদের এ ধরণের বৃটিশ তোষণের জোরালো প্রতিবাদ জানান। ১৯০০ সনে পাটনায় এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহ ব্যাপি অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে দীর্ঘ চার ঘন্টার বক্তব্যে তিনি 'নদওয়াতুল ওলামার' গঠনতন্ত্রের বৃটিশ তোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। সমগ্র ভারত থেতে আগত খ্যাতনামা ওলামা মাশায়েখদের এ সমাবেশ থেকে তিনি ভারতের মুসলমানদের এ ভুলপথে পা না বাড়াতে আহবান জানান। (সূত্র ঃ The Reformer of the Muslim world, P-118)

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা পরিস্কার ভাবে আ'লা হযরত আহমদ রেযা খানের রাজনৈতিক দর্শন বুঝে নিতে পারি যে, তিনি বৃটিশ ও হিন্দুদের প্রতারণার ব্যাপারে সজাগ একজন যোগ্য দিক নির্দেশক ছিলেন। ডঃ মাসউদ আহমদ তাঁর Neglected Geniouns of the East গ্রন্থে বলেন, 'It is his love of freedom that the personalities like Mawlana Fazl-i-Haq (d.1278/1861) and the Martyr poet mowlana Kifayat Ali kafi (d.1275/1858) had been his favourite models.

আর পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান সম্পর্কে মিয়া আব্দুর রশিদ'র উক্তি ,

'The contribution of Hazrat Bareilavi towards Pakistan is not less than of Allama Iqbal and Qa'ed-i-Azam.' অর্থাৎ 'পাকিস্থানের জন্য হযরত বেরলভীর অবদান আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আজমের চেয়ে কম নয়' মন্তব্যটি প্রাণিধান যোগ্য। [সূত্র ঃ Islam in into sub-continent. Lahor)]

সাথে সাথে একটি ব্যাপারে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মূলতঃ হিন্দুরা বৃটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দির শুরুতে। এর আগে এরা ছিলো বৃটিশ শাসনের ফলভোগি। এদের বঙ্কিমচন্দ্র, রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সকল কবি-সাহিত্যিকরা পর্যন্ত বৃটিশদের পক্ষে দালালি সাহিত্য রচনার কাজে নিয়োজিত ছিলো। ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন,

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে বৃটিশের জয়।'

বঙ্কিমের আনন্দ মঠ' সহ অনেকগুলো উপন্যাস ও রচনা ছিলো বৃটিশ পূজা এবং মুসলিম নিধনে আহবান সূচক, এক সন্ত্রাসবাদি দিক-নির্দেশনা। সেখানে মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানোর আহবান দেখা যায় (আনন্দমঠ)। আনন্দ মঠে'র পাতায় পাতায় 'বন্দে মাতরম' জয়ধ্বনি সাথে সাথে মুসলিম (যবন) নিধনের এক উগ্র নির্দেশ শোভা পাচ্ছে। আর এ হিন্দুরাই বিংশ শতাব্দির শুরুতে হঠাৎ বৃটিশ বিরোধী ভূমিকায় মেতে ওঠে। মুসলমানদের তীব্র আন্দোলন ঠেকাতে হিমশিম খাওয়া বৃটিশরা এ সময়ে মুসলমানদেরকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে শুরু করলেই হিন্দুদের আঁতে ঘা লেগে যায় এবং এরা বৃটিশ বিরোধী হয়ে পড়ে। '১৯০৫ সনের পর থেকে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের বৃটিশ বিরোধীতা কট্টর অবস্থানে উপনীত হয়। 'বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সূত্র ধরেই সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত

ঘটে। গড়ে ওঠে অনুশীলন দল ও যুগান্তরের দল। প্রচন্ড চাপের মুখে ইংরেজ সরকার ১৯১১ সনে 'বঙ্গভঙ্গ আইন' রদ করতে বাধ্য হন'। (মোবারক হোসেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুলের অবদান, পৃ-১৪: নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা)

মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজদের এ জাতীয় সিদ্ধান্তগুলোর পরই এরা বৃটিশ বিরোধী হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিজেদের 'স্বরাজ' কায়েমের পক্ষে নিয়ে যেতে নানা রকম রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়।

সমগ্র ভারত বর্ষে হিন্দুরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। সুতরাং মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে এরা সর্ব ভারতীয় আন্দোলনের মা ্যমে বৃটিশ হঠানোর কাজটি ত্বরান্বিত করতে পারলেই পরবর্তীতে দেশের শাসনভার অনায়াসে তাদের হাতে চলে আসবে। এ দূরদর্শি রাজনৈতিক কৌশলকে সামনে রেখেই পরবর্তীতে এদের রাজনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। তাদের রাজনৈতিক কৌশলের দিক গুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সে সময় মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বয়স দেড়শ বছরের মতো হবে। এ আন্দোলন ঠেকাতে বৃটিশ রাজও হিন্দুদের সম্মিলিত শক্তিকেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। 'বৃটিশরা ক্রমেই মুসলমানদের প্রতি নমনীয় হয়ে যাচ্ছে এবং এক সময় মুসলমানদের আন্দোলন সফলতা দ্বার পর্যন্ত পৌঁছবে। ফলে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মুসলমানরাই ভারতের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় ফিরে পাবে।

২. ভারত বর্ষে হিন্দুরা একদিকে সংখ্যা গরিষ্ট। অপরদিকে বিগত দেড়শ বছরের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে গড়ে ওঠা একটি শিক্ষিত ও অর্থশালী জনগোষ্ঠি। সুতরাং এ বৃটিশ বিরোধী রাজনীতিতে তাঁদের প্রভাব মুসলমানদের চেয়ে বেশি থাকবে এবং মুসলমানরাও এ আন্দোলনে হিন্দুদের সহযোগি হিসেবে পেয়ে আশ্বস্থ হবে।

৩. আন্দোলনের কর্তৃত্ব হাতে নিয়েই বৃটিশদের সাথে দর কষাকষি করে অধিকতর সুবিধা আদায় করা যাবে।

৪. হিন্দু ও মুসলমানদের আন্দোলন আলাদা আলাদা পথে এগুলে সমগ্র ভারতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মুসলমানরা সমগ্র ভারতে না হলেও অন্ততঃ ভারতের অংশ বিশেষে হলেও ক্ষমতা লাভ করবে। সুতরাং মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পথ চলা বন্ধ করতে হবে।

৫. মুসলমানদের পৃথক অবস্থানকে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধারায় বিলীন করে নিতে পারলে তাদের অস্তিত্ব ও বিলীন করা যাবে। এ জন্য তাদের সে কৌশলের নাম হতো-ধর্মনিরপেক্ষ কৌশল। হিন্দু- মুসলিম ঐক্য কৌশল। অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের অন্যতম নীতি হলো ধর্মের চেয়ে দেশ বড়ো।

৬. আর এ সর্ব ভারতীয় আন্দোলন (এক জাতিতত্ত্ব) সফল হলে সংখ্যাগরিষ্ট এ প্রভাবশালী নেতাদের কারণে অখন্ড ভারতের নিয়ন্ত্রণ থাকবে হিন্দুদের হাতে। সুতরাং সহজেই 'স্বরাজ' কায়েম সম্ভব হবে। আর এ জন্য সরল মুসলমানদের

সমর্থন লাভের সহজ উপায় হলো কিছু আলেম-ওলামাদের দলে ভিড়ানো এবং তাদের কাছ থেকেই এর পক্ষে ফতোয়া নেওয়া।

৭. আন্দোলন পুরোপুরি সফল না হলেও মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে নিজেদের স্বরাজ অর্জনে একীভূত রেখে মুসলমানদের বিভক্ত রাখা যাবে। বিশেষতঃ হিন্দু মুসলমানদের মিলিত এ আন্দোলন যেহেতু হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে সুতরাং বৃটিশ সরকারের সাথে হিসেব-নিকেশেও অগ্রাধিকার থাকবে হিন্দুদের।

মূলত : উপরোক্ত সম্ভাব্য অর্জনের দিক বিবেচনা করেই হিন্দুরা আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করে। ভারতের রাজনীতির পূর্ববর্তী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি সফল হয়ে যেতো। এরপরও এ আন্দোলন কৌশল তাদেরকে অনেকাংশে লাভবান করেছে। বৃটিশ রাজ ভারত ত্যাগের আগে ভারত-পাকিস্থান বিভক্তিতে হিন্দুদের সুবিধা দিয়েছে বেশি। হিন্দু বৃটিশরা শেষ মুহূর্তে চক্রান্তের মাধ্যমে এমন কিছু সমস্যা মুসলমানদের কাঁধে স্থাপন করেছে যার বোঝা এখনো বইতে হচ্ছে এবং আরো বহু বছর হয়তো বইতে হবে। কাশ্মীর- এর অন্যতম উদাহরণ। সবদিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধী নেতৃত্বাধীন হিন্দু সমাজই বেশি লাভবান হয়েছে। এক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী হিন্দুদের পক্ষে একজন দূরদর্শি নেতার ভূমিকা পালন করেন। ঠিক একইভাবে এ রাজনৈতিক ধারার বিপরীতে যে রাজনৈতিক দর্শনটি মূলতঃ মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হতো সেটা ছিলো আ'লা হযরতের দেওয়া মুসলমানদের স্বতন্ত্র আন্দোলনের ধারা। শুরুতে এ আন্দোলনের কৌশল মুসলমান নেতারা গ্রহণ করলে হিন্দুরা এতোটুকু সুবিধা নিতে পারতোনা। মুসলমানদের আন্দোলন কোরান-সুন্নাহর আলোকে এবং ইসলামি শাসন কায়েমের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে গেলে, সমগ্র ভারতে সম্ভব না হলেও অন্ততঃ পরবর্তীতে সৃষ্ট পাকিস্থানকে পরিপূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হোতো। কিন্তু ১৯২১ পর্যন্ত, জীবনের শেষ বিছানা থেকেও তিনি মুসলমানদের চেষ্টা করেছেন-সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের স্রোত থেকে সংখ্যালুঘ মুসলমানদের ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তারা বৃটিশ শক্তির ক্রীড়নক হিন্দু-ওহাবী চক্রের বিভ্রান্তির অন্ধকারে হাবুডুবু খেয়েছে। অবশেষে, ১৯২৬ সনের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা তাদের সে ঘোর কেটে দিয়েছে। দেওবন্দি ওহাবী-মৌলভীদের অংশটি হিন্দুদের সাথে 'বন্দে মাতরম'র পক্ষে থেকে গেলেও মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ সুন্নীরা স্বতন্ত্র রাস্তায় চলে আসে। আর, আ'লা হযরতের চিন্তাধারায় দেরীতে হলেও ফিরে আসা দুই মহান নেতা আল্লামা ইকবাল ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এর ব্যানারে, এ আন্দোলনের সুবাধে, এ ভারত বর্ষে মুসলমানদের একটি নিজস্ব দেশ পাকিস্থান কায়েম হয়ে যায়। অবশ্য বাংলার দুই মহান নেতা শেরে বাংলা এ,কে,ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সুতরাং এ ভারত বর্ষের হিন্দুরা মহাত্মা গান্ধীকে, আর মুসলমানরা আ'লা

হযরতকে ভুলে থাকতে পারে না।

শুরু থেকে মুসলমানদের আন্দোলন ঠিক পথে এগুলে হয়তো মুসলমানরাই আবার সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব নিতে পারতো। বৃটিশ আগমনের পূর্বেও মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিলো। অথচ, হাজার বছর ধরে ভারত তাদেরই শাসনাধীন থেকেছে। ওহাবীদের আঁতাতের রাজনীতির কারণে আজ আমরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃপা যে, শেষ পর্যন্ত ওহাবীদের খপ্পর থেকে এদেশের মানুষ বেরিয়ে এসেছিলো। অন্যথায় অবিভক্ত ভারতের হিন্দু শাসনের অধীন হয়েই অপমান জনক জীবন-যাপন করতে হোতো আমাদের। উক্ত ভারতীয় রাজনীতি বিশ্লেষণে আরো কিছু বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যায় যে, ওহাবীদের রাজনীতি মূলতঃ ধর্ম নিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী ধারার। যা কোনোভাবেই ইসলামি রাজনীতি হিসেব গণ্য হতে পারে না। বরং ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় ওহাবীদের রাজনীতি বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত এমন একটি ধারাতে বিবেচনা করা যায়- যে ধারার কারণেই সমগ্র বিশ্বব্যাপি মুসলমানদের কেন্দ্রিয় শাসন তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ফলে সে সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের ঐতিহ্য ও শক্তির পতন হয়েছে। এরা আরব জাতীয়তাবাদের নামে বৃটিশদের পক্ষে, তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ফলে সে সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের কেন্দ্রিয় শাসন তুর্কী সালতানাতের পতন ত্বরান্বিত হয় এবং খ্রীষ্টান-ইহুদীদের নিয়ন্ত্রন জোরদার হয়। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া 'ইসরাইল'ও এভাবে সৃষ্টি হয়েছিলো। তাছাড়া সউদী আরবের কেন্দ্রিয় ওহাবী শাসন তো রাজতান্ত্রিক পদ্ধতির, ইসলামি পদ্ধতির নয়। সউদি আরব এখনো ইংরেজদেরই দালালিতে লিপ্ত আছে-যা সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা (হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত রাজনীতি) এবং জাতীয়তাবাদী (এক ভারতীয় মতবাদ) হিন্দু প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নের আন্দোলনে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে 'ধর্মের চেয়ে দেশ বড়' এ ইসলাম বিরোধী বুলি উড়িয়েছিলো। অথচ, ইসলাম দেশ প্রেমকে ঈমাদের অঙ্গ যেমন বলেছে, ঠিক তেমনি ঈমান রক্ষা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ ত্যাগ (হিজরত)'র কথা বলেছে। 'দেশের চেয়ে ধর্ম বড়' বলেই তো হিজরত করেছেন স্বয়ং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা; জন্মভূমি মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা। আর হিজরতের জন্য আরবের সে পরিস্থিতি ও বিদ্যমান থাকা চাই, যা ইসলামের শুরুতে বিদ্যমান ছিলো। অন্যথায়, দেশত্যাগ ইসলামের ক্ষতিই ডেকে আনবে। এটাই সুন্নিয়ত ভিত্তিক ধারণা। আ'লা হযরতের ধারণা। সুতরাং সুন্নিদের রাজনীতি জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আত্মঘাতি কৌশলের বিপরীতে, সুন্নি মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রাজনীতি। এটাই আ'লা হযরতের রাজনীতির দর্শন।

অর্থনীতি

আ'লা হযরত অর্থনীতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো দিয়েছিলেন সে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। এসময় অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানির মতো উন্নত দেশেও মাত্র বিশেষ কিছু বুদ্ধিজীবি শ্রেণী এই বিষয়ে জানার চেষ্টা করতো। সে সময় কিছু কিছু বই প্রকাশিত হলেও এতে পাঠকদের আগ্রহ দেখা যেতো না। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অর্থনীতি ছিলো একটি নিরস বিষয়। ছাত্রীরা এ বিষয় পড়তোনা বললেই চলে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালগুলোতে ও এ বিভাগে খুব নগন্য সংখ্যক ছাত্র লেখাপড়া করতো। এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। অর্থনীতি বিষয়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। আর এ অর্থনৈতিক আগ্রহের যুগ মূলতঃ শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, বিশেষতঃ ১৯২৯-৩০ এর অর্থনৈতিক মহা মন্দা (Great depression of 1929-30) পর হতে। এসময় থেকেই সরকার ও জনগণ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। Depression নিয়ন্ত্রনের জন্য বিদ্যমান উচ্চ শ্রেনীর তত্ত্বগুলো এ সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় নতুন তত্ত্বের সন্ধান জরুরি হয়ে পড়ে। এমন সময় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। J.M.Kaynes নামক একজন বৃটিশ অর্থনীতিবিদ তাঁর বই "The theory of Employment, interest and money" প্রকাশ করে, যা বিশ্বে অর্থনীতি ভাবনায় বিপ্লব আনে। এ তত্ত্ব মন্দা ও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। Keynes তাঁর নতুন তত্ত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ অর্থনীতির প্রভু বনে যান। সুতরাং আজ এ কথা বলা যায় যে, নতুন অর্থতত্ত্ব'র বিকাশ ১৯৩০ এর পর থেকে, অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আহমদ রেযা খাঁন তাঁন নতুন তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন ১৯১২ সনে। যা J.M.Keynes এর তত্ত্বের আদিরূপ ছিলো। ভারতীয় বিত্তবান মুসলমানরা সময় মতো এ দিক নির্দেশনাকে গুরুত্ব দিলে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারতো। আ'লা হযরতের যে তিনটি নির্দেশনা এ নতুন অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সংশ্লিষ্ট এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হওয়া দরকার।

প্রথম নির্দেশনা ঃ "সরকারের হস্তক্ষেপ দরকার এমন ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে, মুসলমানদের বিবাদ-বিচার সমূহের নিষ্পত্তি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যাতে মামলা মুকাদ্দমায় ব্যয়িত কোটি কোটি টাকা বাঁচানো যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য"।

তাঁর উপরোক্ত তত্ত্ব পর্যালোচনা'র পূর্বে সে সময়ের ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র সামনে থাকা দরকার। বৃটিশ শাসনের এ পর্যয়ে মুসলমানরা ছিলো নিঃস্ব-অসহায় সম্বলহীন। হাতে গোনা স্বল্প সংখ্যক জমিদার শ্রেণীর মানুষগুলো নিজেদের জমি-জমা সংক্রান্ত এতো বেশি মামলা-মুকাদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে যে, যা তাদের ধীরে ধীরে আর্থিক ভাবে দুর্বল করে ফেলেছিলো। একেতো বৃটিশ দেওয়ানী পদ্ধতির আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা। একেকটি নিষ্পত্তিতে দশ-বিশ

বছরও লেগে যেতো। অন্য দিকে, মামলার খরচের বহুমুখি খাত যেমন; উচ্চ মূল্যের ষ্ট্যাম, উকিল ফিস ইত্যাদির অনিবার্য পরিণতি। সবকিছু মিলিয়ে এক একটি মামলার পিছনেই সমস্থ সম্পত্তির মূল্য, এমনকী তার চেয়েও বেশি খোয়াতে হতো বৃটিশ আদালতে। উকিল-মুখতারদের প্রায় সকলেই ছিলো হিন্দু-এদের হোতো পোয়া বারো। নিজের কলে নিজের মরণ ডেকে আনতো মুসলমান বিত্তশালীরা, এ মামলা মুকাদ্দমার শাখের করাতে আটকা পড়ে। অথচ, মুসলমানদের হাত থেকে খোয়া যাওয়া এ টাকাগুলো চলে যেতো হিন্দু উকিল-কর্মচারী, 'আর বৃটিশ রাজ কোষাগারে। আ'লা হযরত এ টাকাগুলো রক্ষা করতে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদন জানিয়েছেন, নিজেদের মামলা-মুকাদ্দমার বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে সালিশী মীমাংসার মাধ্যমে নিস্পত্তি করার। তিনি আফসোস করে বলেছিলেন, মীমাংসা মনপুত না হলে তারা বৃটিশ আদালতের আশ্রয় নিচ্ছে। অথচ, আদালতে ভিটে বাড়ি হারালেও সে রায় মেনে নিচ্ছে। অবশ্য এ উপদেশ তাদের প্রভাবিত করতে না পারলেও একদিন এ জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিলো। ১৯৪৭ এরপর বল্লভ ভাই প্যাটেল জমিদারী বিলুপ্ত করে এবং মুসলিম জমিদারদের উচ্ছেদ করার পর এ ভূমি সংক্রান্ত মামলা গুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

ইমাম আহমদ রেযা'র উপরোক্ত তত্ত্ব থেকে আধুনিক অর্থনীতির সঞ্চয় (Savings) এবং বিনিয়োগ (Investment) ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি অযথা মামলা-মুকাদ্দমায় এবং বিলাসিতায় টাকা অপচয় করার বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেন। যে অতিরিক্ত টাকা বিত্তবান মুসলমানরা অসতর্কভাবে অপচয় করছিলো তা পরিকল্পিত ভাবে সঞ্চয় (Savings) এবং বিনিয়োগ করতে তিনি আহবান জানিয়েছিলেন। তাঁর এ তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Keynes, ১৯৩৬ সনে। অর্থাৎ আরো চব্বিশ বছর পর।

J.M. Keynes ম্যাক্রো অর্থনীতির এ তত্ত্ব অনুসারে, অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য সঞ্চয় (Savings) এবং বিনিয়োগ (Investment) সমান হতে হবে। যদি এ দুই পরিবর্তন (Variable) 'র ভারসাম্য নষ্ট হয়, তবে অর্থনীতি মন্দার শিকার হবে, আর এ পরিস্থিতি রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর।

তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া-পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা'র রূপকার। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশগুলো এ পরিকল্পনা স্ব স্ব দেশে প্রয়োগ করছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আর্থিক উৎস ধরা হয় দু'টি। ১. জাতীয় সঞ্চয় (National Savings) এবং ২. ঋণ (Lone)। জাতীয় সঞ্চয় অপর্যাপ্ত হলে উন্নয়নশীল দেশকে এ জন্য নির্ভর করতে হয় বিদেশী ঋণ এবং মঞ্জুরীর উপর। উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের তৃতীয় পদ্ধতি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের অবিনিময় যোগ্য মুদ্রা ইস্যুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিন্তু এ পদ্ধতি মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করে, যা অনিয়ন্ত্রিত হলে অর্থনৈতিক সমস্যা বা বিপর্যয় ঘটায়। সুতরাং উন্নয়নের এক্ষেত্রেও জাতীয় সঞ্চয়'ই শ্রেষ্ঠ উপায়।

জনগণের আয় (Income) কম হবার কারণে উন্নয়নশীল দেশের সঞ্চয়স্তরও নীচে

থাকে। অর্থনীতিবিদদের ধারণা অনুসারে, অনুন্নত দেশগুলোর (Under developed Country) সঞ্চয় মাত্র শতকরা ৫ থেকে ৮ ভাগ। অথচ, উন্নত দেশে এ সীমা জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-১৮ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এ সঞ্চয়ের পরিমাণ বর্ধিত করে ১৫% এ উন্নীত করা।

Keneys'র সমীকরণ (equation) অনুসারে S=1, যদি সঞ্চয় (Savings) বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় বিনিয়োগ (Investment) ও বৃদ্ধি পেতে থাকবে সে অনুপাতে।

১৯৫০ সনে, কলিক ক্লার্ক (Colin Clark) নামের এক আমেরিকান অর্থনীতিবিদ পরামর্শ দেন যে, ভারত, পাকিস্থান এবং চীন প্রত্যেকই তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদের জাতীয় আয়ের ১২% জমাতে পারে। যা তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ জাতীয় সঞ্চয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। এমতাবস্থায় আমরা যদি ১৯১২ সালের দিকে ফিরে তাকায়, তবে দেখবো যে আহমদ রেযা (রহ.) এ অর্থনৈতিক উপদেশটিই দিয়েছিলেন মুসলমানদেরকে। যা বর্তমানে পৃথিবীর অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতির অন্যতম দাবী হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

আ'লা হযরতের প্রথম নির্দেশনা সঞ্চয়তত্ত্ব (Saving theory) বুঝতে হলে তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরামর্শ ও বুঝতে হবে, যেখানে তাঁর বিনিয়োগ (Investment) ধারণার পরিপক্কতা প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় পরামর্শ ঃ তাঁর দ্বিতীয় পরামর্শে, তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, ক্যালকাটা ও হাইদরাবাদের বিত্তবানদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যেনো তারা তাদের মুসলিম ভাইদের কল্যাণে সুদবিহীন ব্যাংক তথা মুসলিম কমর্শিয়াল ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে।

১৯১২ সনে, যখন তিনি এ পরামর্শ দিচ্ছিলেন তখন সমগ্র ভারতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ব্যাংক ছিলো- যা হয়তো হিন্দুদের, নতুবা বৃটিশদের মালিকানায় ছিলো। ১৯৪০ সন পর্যন্ত ভারতে কোনো মুসলিম ব্যাংক ও ছিলো না। সুতরাং এ সময় একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের প্রভাবশালী ভূমিকার বিষয়টি সর্বসাধারণের বোধগম্য না হওয়ারই কথা; যা তাঁর মতো দূরদর্শি সংস্কারকের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

একটি দেশের অর্থনীতিকে সফল করতে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রেডিট হলো বাণিজ্যের প্রাণ, যা ব্যাংক যোগান দেয়। ব্যাংক জনগণের সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করে এবং উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। তাই তাঁর রূপরেখা ছিলো এই যে, মুসলমানরা অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা এবং মামলা মুকাদ্দমার ধ্বংসাত্মক আর্থিক হয়রানি থেকে বেরিয়ে আসলে উক্ত টাকা বিশাল অংকের সঞ্চয়ে রূপান্তরিত হবে। যা মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকে জমা থাকবে। এবং ব্যাংক সে টাকা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে উপযুক্ত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সৃষ্টিতে সহায়তা

করবে। যা তৎকালীন সময়ের দুর্বল মুসলমানদের একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে দিয়ে যাবে। শিল্প ও বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারকারী হিন্দু বেনিয়াদের সাথে মুসলিম ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একই স্তরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। অথচ, বিত্তবান মুসলমানরা এ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সে সময় উপলব্ধি করতে পারলেন না। তবে, তারা এ ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেয় আরো পয়ত্রিশ বছর পর। যখন এ ব্যাপারটি জিন্নাহ সাহেবের মতো দূরদর্শি নেতার মাথায় ঢুকলো এবং তিনি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলেন। মুসলিমদের আর্থিক উন্নয়নে মুসলিম ব্যাংক'র গুরুত্বের ব্যাপারটি তাঁর পক্ষ থেকে তুলে ধরার পরই অবিভক্ত ভারতের শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম পুঁজিপতি স্যার আদমজি, দাউদ ও মির্জা ইস্পাহানির মতো ব্যক্তিরা এগিয়ে আসেন এবং ১৯৪৭ সনের ৯ জুলাই কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক'। অথচ, এর মাত্র একমাস পরই জন্মলাভ করে পাকিস্থান রাষ্ট্র (১৪ আগষ্ট ১৯৪৭)। ফলে, পাকিস্থানের কোষাগার ছিলো শুন্য। মুসলমানদের শিল্প বা ব্যাংকিং কোনো ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ছিলো না। বিরাজ করছিলো অর্থনৈতিক শুন্যতা। অথচ, সময় মতো আ'লা হযরতের পরিকল্পনা মুসলমানদের মধ্যে গৃহীত হলে, সেদিন পাকিস্থান রাষ্ট্র অন্ততঃ পয়ত্রিশ বছরের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও পুঁজি নিয়ে নতুন একটি রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করতে পারতো। যা পাকিস্থান এবং এর পূর্বাঞ্চল হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশকেও উপকৃত করতো।

এখানে একটি বিষয় পরিস্কার হয় যে, আ'লা হযরত মুসলমানদের সঞ্চয় (Saving) উৎসাহিত করার সাথে সাথে এর ব্যক্তিগত কুক্ষীগতকরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন। যা, একদিকে কোরান সুন্নাহর প্রতিধ্বনি এবং অন্য দিকে আধুনিক অর্থনীতির বাস্তব চিত্রের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সঞ্চয় যাতে নিজস্ব ভান্ডারে মজুত না থাকে সে জন্য বলেছেন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে। সুতরাং তাঁর প্রথম নির্দেশ সঞ্চয় (Savings) এবং দ্বিতীয় নির্দেশ হলো তা যেনো ব্যাংকে জমা হবার ব্যবস্থা হয়। ব্যক্তিগত ভান্ডারে নয়। তাঁর এ দূরদর্শি চিন্তাধারাকে আধুনিক অর্থনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোধগম্য হবে।

আধুনিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে সঞ্চয় দুই প্রকার। ১. সঞ্চয় (Savings) ২. মজুতকরণ (Hoarding)। এখানে সঞ্চয় বলতে ব্যাংক বা জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পে জমা রাখা বুঝায়, আর মজুতকরণ হলো নিজস্ব ভান্ডারে লুকায়িত থাকা। কোনে ব্যক্তির ১০০ টাকা রোজগারের ২০ টাক সঞ্চয় (প্রথম ক্ষেত্রে) বলতে বুঝাবে, ঐ ব্যক্তির নিজস্ব সঞ্চয় ২০ টাকা এবং জাতীয় সঞ্চয় ২০ টাকা। এবাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেতে পেতে জাতীয় খরচ অপেক্ষ বেশি হয়ে গেলে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত আয় হবে জাতীয় সঞ্চয়। আর ব্যাংক বা National Saving Scheme-এ বিনিয়োগকেই বলে সঠিক সঞ্চয় (Proper Savings) । আর যদি, কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে পুঞ্জিভূত করে ফেলে, সমাজের প্রয়োজনে বন্টনের সুযোগ রহিত করে, তবে একেই বলে Hoarding । Savings জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করে বিধায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। আর Hoarding ধরণের সঞ্চয়ের ফলে

অর্থনীতির ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটে। ফলে Kaynes'র সমীকরণ Saving (সঞ্চয়) = Investment (বিনিয়োগ) এ তারতম্য ঘটে, বিধায় অর্থনীতি মন্দা ও স্ফীতির শিকার হতে বাধ্য হয়। যা একটি দেশ বা জাতিকে সর্বক্ষেত্রে আঘাত করে। আর আধুনিক অর্থনীতির এ ধারণা বিকাশের অন্ততঃ দু যুগ আগে, একই তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত, যা অনুসৃত হলে মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্যভাবে লিখিত হতো। আ'লা হযরতের ব্যাংকিং তত্ত্ব মূলতঃ কোরান-সুন্নাহর গবেষণার ফল। যেখানে অপচয়কারীকে বলা হয়েছে শয়তানের ভাই, যা সঞ্চয়ের ইঙ্গিত করে। আবার বলা হয়েছে, 'বিত্তশালীদের সম্পদে অভাবী, মিসকিন, ফকির, বঞ্চিত, নিঃস্ব মানুষদের হক্ব (অধিকার) রয়েছে' যা সম্পদের সামাজিক বন্টনের ইঙ্গিত বহন করে। ইসলাম মজুতদার কে অভিশাপ দেয়, সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে সঞ্চয় হবে একই সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। ইসলাম Savings কে উৎসাহিত করছে, Hoarding কে নয়। 'কৃপন জান্নাতে যাবে না' -আল হাদীস। সে বান্দার হক্ব (হক্কুল ইবাদ) নষ্টকারী। আল্লাহর হক্ব নষ্টকারী ক্ষমার যোগ্য হলেও বান্দার হক নষ্টকারীকে ক্ষমার অযোগ্য বলা হয়েছে। যারা সম্পদ জমা (কুক্ষিগত) করে এবং বার বার গণনা করে তাদের জন্য রয়েছে 'হোতামাহ্' দোজখ। (আল-কুরআন)

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর এ অর্থনীতি জাতীয় ভারসাম্য রক্ষার জন্যই নির্দেশিত হয়েছিল, যা আ'লা হযরতের কলমে আধুনিকায়ন হয়েছিল।

তৃতীয় নির্দেশনা ঃ এ তত্ত্বের মূলকথা হলো, 'মুসলমানরা শুধুমাত্র মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই পণ্য ক্রয় (বা আমদানী) করবে'।

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এ তত্ত্বটিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব আছে বলে মনে হলেও; অর্থনীতিবিদদের চোখে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পশ্চিম ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের কৌশল পর্যালোচনা করলে তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার প্রতিফলন বলে প্রমানিত হবে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো মূলতঃ এ তত্ত্ব গ্রহণ করেই তাদের অর্থনীতি পূর্ণগঠন করে এবং বর্তমানে উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে, করাচি থেকে প্রকাশিত অর্থনীতির অধ্যাপক এম.এ.কাদির কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত বই 'Economic guidelines for muslims proposed Imam Ahmed Raza Khan in 1912 AD' গ্রন্থে লেখক বলেন; "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন বালক হিসেবে লক্ষ্মৌ'র মুসলিম ব্যবসায়ীদের দোকানে, আমি এ কবিতাটি লিখিত দেখেছি, 'If the Muslim desires an honourable life in India, he should always purchase every artical from a Muslim' অর্থাৎ, ভারতের মুসলমানেরা সম্মানজনক জীবন-যাপন চাইলে সে যেনো তার প্রত্যেক জিনিস মুসলিম থেকে ক্রয় করে। 'জিন্দেগী ইজ্জত কী মুসলিম হিন্দ মে চাহে আগর, তু ইয়ে লাজেম হ্যায় কে সওদা যব বিহী লে- মুসলিম সে লে'। আর, এ কবিতাটি ছিলো মৌলানা আহমদ রেযা খানের

তৃতীয় তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি। তিনি বলেন, এই কবিতা আমাকে বেশ প্রভাবিত করেছিলো, কিন্তু আমি দেখেছি সামর্থবান মুসলমানরা নানা রকমের জিনিস পত্র কিনেছে হিন্দু দোকান থেকে। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে অর্থনীতি বুঝার মতো কিছু কিছু লোক গড়ে ওঠেছিলো, কিন্তু না, এরা এ তত্ত্ব গ্রহণ করলোনা। এরা অর্থনৈতিক দূরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ইউরোপের সূতার টানে নির্ভর করলো অথচ, ভুলে গেলো যে, তাদেরই একজন মহাজ্ঞানী তাদেরকে একটি উপকারী নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ তত্ত্বটি কেউ বুঝলোও না, কেউ বিশ্লেষণ ও করলোনা। কোনো অর্থনীতিবিদ ও ব্যাখ্যা করে দেখাতে পারলো না যে, এর এক সুদূর প্রসারি ফল রয়েছে। মুসলমানরা সময় থাকেতে সতর্ক হলে আজ তারা অন্যদের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তোনা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রক্ষণশীল হবে নাকি অবাধ (Free) হবে'- এ বিতর্ক অনেক পুরোনো। ইউরোপ আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা এ বিতর্কে অংশ নেন। অর্থনীতির জনক Adam Smith ছিলেন মুক্ত বাণিজ্যের (Free trade) সবচেয়ে বড় উকিল (Advocate) । তবে মুক্ত বাণিজ্য বিরোধীরা দেশীয় শিল্পের উন্নয়নকে বিদেশীদের প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়ে রাখতে, রক্ষণশীলতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অ্যাডাম স্মীত'র বই An Enquiry into the wealth of Nations' প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সনে। ১৯৯১ সনে, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন নামক এক আমেরিকার রাজনীতিবিদ মুক্ত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে এবং রক্ষণশীলতার পক্ষে জোড়ালো সমর্থন জানান। জার্মানির Free Oiric ও রক্ষণশীলতার (Protection) পক্ষে অকাট্য যুক্তি উথাপন করেন। যে যুক্তিটি Free trade এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়, তাহলো দেশীয় শিল্পায়ন কে বিদেশী প্রতিযোগীতা থেকে রক্ষা করার বিষয়টি। বিদেশী শিল্পের দাপটে দেশী শিল্পের মৃত্যু ঘটবে, যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়। অপর পক্ষে যুক্ত হলো, অবাধ বাণিজ্য হলে জাতীয় ধারণাদ্বয়ের সাথে আ'লা হযরতের তৃতীয় তত্ত্বটি পর্যলোচনা করা যেতে পারে।

১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ ভারত বর্ষে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায় এবং বৃটিশ বেনিয়ারা পাকাপোক্তভাবে শাসন ভার হাতে নেয়। ১৯১২ সনের দিকে যখন আ'লা হযরত এ তত্ত্ব দিচ্ছিলেন, তখন বৃটিশ শাসন মজবুত শিকার গেড়ে ফেলেছে।

সুতরাং এর মাত্র ৩৫ বছরের মাথায় যে (১৯১২-৪৭) ইংরেজদের ভারত ছাড়তে হবে এ কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। তখন মুসলমানদের না ছিলো কোনো নিজস্ব শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা, না ছিলো কোনো আর্থ-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ধারণা। মুসলমানদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও দারিদ্র দূরীকরণে এ সময়ে এগিয়ে এসেছিলেন ইমাম আহমদ রেযা। অথচ, শিক্ষিত লোকগুলোও তাঁর চেতনার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হলো না, বরং দুঃখজনক ভাবে এরা পাশ্চাত্যের শরণাপন্ন হয়ে পড়ে। আজ তাঁর এ তৃতীয় তত্ত্ব পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে, তিনি মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে চেয়েছিলেন। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে

এ সময় হিন্দুরা অনেক অগ্রসর ছিলো। হিন্দু বণিকরা সর্বোচ্চ মুনাফা হাতিয়ে নেওয়ার তালে লিপ্ত ছিলো। মুসলমানদের ছিলো না কোনো বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতা। কোনো মুসলিম ব্যবসা শুরু করার সাহস দেখাতে গেলেই হিন্দুরা ছলেবলে-কৌশলে তাদের এ পেশা থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধ পরিকর ছিলো। মুসলমান সমাজ থেকে আর্থিক সহায়তা না পাওয়ার কারণেও তারা ব্যবসায় থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হতো।

মুসলিম ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের অবস্থা দাঁড়ালো সে, শিল্পায়নের মতো যাকে বিদেশী নির্মম প্রতিযোগীতা থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। সুতরাং যে মুসলিম দোকানদার ব্যবসায়িক উন্নতি চায় তাঁকে অবশ্যই আর্থিক সাহায্য করতে হবে। তাঁর পুঁজি বৃদ্ধি পেলে, সে মুসলিম মজুতদারের নিকট থেকে আরো বেশি মালামাল আনতে পারবে। ফলে আড়তদার ও মুসলিম উৎপাদনকারী (Manufacturer) থেকে আরো বেশি কিনতে পারবে। আর এ মুসলিম শিল্পের বা উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আরো বেশি উৎপাদন করবে এবং বিক্রি করবে। এভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আরো বেশি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি, শ্রম এবং পুঁজির প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এতে মুসলিম শ্রমিকদের চাকুরির সুযোগ বাড়বে। তাদের আয় বাড়লে কার্যকরি চাহিদা ও বৃদ্ধি পাবে। যা মুসলমানদের উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে-একটি শৃঙ্খলিত নিয়মে ধীরে ধীরে। আর মুসলিম শিল্পপতিদের পুঁজি কোথেকে আসবে? এ প্রশ্নের উত্তরও রয়ে গেছে, তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় তত্ত্বে। অর্থাৎ তারা সঞ্চয় করবে এবং বিত্তবানরা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবে, এ পুঁজি সংগ্রহের জন্য। যা শিল্পে বিনিয়োগ করা হবে।

Kynes এর 'Employment, interest and money' তত্ত্বে কার্যকরি চাহিদা (effective demand) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অথচ, এ কার্যকরি চাহিদা (effective demand) 'র পরিস্কার ধারণা দেওয়া হয়েছিল ইমাম আহমদ রেযা (রহ)'র তৃতীয় তত্ত্বে। কিন্তু আজ এ তত্ত্বের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গেছে Kynes'র পক্ষে। এ তত্ত্বের জন্য আমরা পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে নিমজ্জিত থাকলাম যে, একদিন আমাদেরই এক বিখ্যাত সংস্কারক ব্যক্তিত্ব এ ধারণাটি প্রথম প্রদান করেছিলেন।

আ'লা হযরতের এ তৃতীয় দিক নির্দেশনা মুসলিম দেশগুলোতে গৃহীত না হলেও একই তত্ত্ব অনুসৃত হতে দেখা যায়, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামে জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স ইত্যাদি পশ্চিম ইউরোপিয় দেশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। যুদ্ধের পর জার্মানি দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব জার্মানি কমিউনিস্ট ব্লকে এবং পশ্চিম জার্মানি পুঁজিবাদি ব্লকে চলে যায়। অর্থনৈতিক পুণর্গঠনকে প্রথম বিবেচনায় এনে পশ্চিম জার্মানি খুব শ্রীঘ্রই উন্নতি করতে সক্ষম হলো। রোম চুক্তি (Rome Treaty) 'র ফলে পশ্চিম ইউরোপিয় দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় ইউরোপিয় সাধারণ বাজার (European Common Market)। কারণ, পশ্চিম জার্মানি একার পক্ষে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্ভব

ছিলোনা। আর এটা সে সময়ের কথা, যখন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতি শাসন করছিল এবং ডলার ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বি (আন্তর্জাতিক) বিনিময় মুদ্রা। আর এমন অবস্থায় প্রতিযোগিতা মূলক অর্থনৈতিক দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ পশ্চিম ইউরোপিয়রা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক এক নতুন বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করলো, যা 'মুসলিম মুসলিমের নিকট থেকেই ক্রয় করবে' আ'লা হযরতের এ অর্থনৈতিক পুণর্গঠনের নীতিরই বাস্তবায়ন মাত্র। এ রোম চুক্তি (E.C.M.) অনুসারে, এ চুক্তিতে উপনীত সদস্য দেশগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। কোনো জিনিস সদস্য দেশে উৎপাদিত হলে তা অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি বা কিনা যাবে না। রপ্তানীকে উৎসাহিত করা হবে, অথচ আমদানীর ক্ষেত্রে করের বোঝা চাপাতে হবে-যাতে দেশের টাকা বাইরে না যায়। সদস্য দেশগুলো নিজেদের এক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র'র মতো এক ও অভিন্ন মনে করবে। মোট কথা, পশ্চিম ইউরোপিয় সম্প্রদায় নিজেদের সুবিং· অনুসারেই ব্যবসায়িক কৌশল গ্রহণ ও প্রয়োগ করে। ফলে, নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সহযোগিতা অচিরেই তাদের ধ্বংস প্রাপ্ত অর্থনীতি পূণ নির্মাণে সহায়ক হয়ে যায়। শুরুতে এ ইয়োরোপিয় কমন মার্কেট (E.C.M) কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই সংশয় সন্দেহ ছিলো। কিন্তু কালক্রমে এ কৌশলের সফলতার ফলেই তারা আজ মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে যেতে পেরেছে। কমন মার্কেট' ধারণা ও সফল হয়েছে এবং এর সদস্য দেশগুলো ও উপকৃত হয়েছে। এমনকি একসময় জার্মানি মুদ্রা মার্কিনী মুদ্রাকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলো। E.C.M ধারনা সফলতা অর্থনীতির এক নতুন শাখার জন্ম দেয়। এ তত্ত্বের নাম Theory of economic integeration' বা অর্থনৈতিক পূর্ণতার তত্ত্ব বা অখন্ডতার তত্ত্ব।

আ'লা হযরত এ তত্ত্ব মুসলিম সমাজের কাছে দিয়েছিলেন সে আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত তাদের অর্থনীতিকে পূণর্জীবিত করতে। নিজেদের মধ্যে 'মুসলিম কমন মার্কেট' গড়ে তুলতে। নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়িক সহযোগিতা গড়ে তুলতে। নিজেদের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য বা Free trade জোরদার করতে।

আ'লা হযরতের উপরোক্ত অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এখানো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। এখনো মুসলিম দেশগুলোতে সুদবিহীন ব্যাংকিং ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম আশানুরূপ নয়। এখানো অপচয়- অপব্যয় আমাদের জাতীয় সঞ্চয়ের প্রতিবন্ধক হিসেবে সক্রিয় আছে।

বিশেষতঃ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'ইসলামি কমন মার্কেট' গঠনের গুরুত্ব এখনও তাৎপর্যপূর্ণ।

Global Village এবং মুক্ত অর্থনীতির এ যুগে বহু জাতীয় আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলোর অর্থনৈতিক কৌশলের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখতে এর গুরুত্ব সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করা আজ দরকার বলে মনে হচ্ছে।

ইউরোপীয় সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে পৃথক বিনিময় মুদ্রা 'ইউরো' চালু করে ফেলেছে, আমরা মুসলমানরা কি পারি না?

পরিশিষ্ট ঃ

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ঃ জ্ঞানের এক চলন্ত বিশ্বকোষ

বিস্ময়কর জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী এক বিরল প্রতিভা মৌলানা আহমদ রেযা বেরলভী (রহ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলীতে সিপাহী বিপ্লবের আগের বছর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুফতি নকী আলী খাঁন এবং পিতামহ মুফতি রেযা আলী খাঁনও সমসাময়িক কালের প্রভাবশালী দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। আলৌকিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী আহমদ রেযা মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস ৫দিন বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শেষ সনদ লাভ করে এবং যোগ্য আলেমদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (সূত্র ঃ Dr. Muhammed Ahmed: The Reformer of the Muslim World; Karachi-Pakistan : P-18)

কিংবদন্তিতুল্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী আহমদ রেযা বেরলভী রমজান মাসের প্রথম দিন থেকে সাতাশ তম দিবস পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই কুরআন শরীফ হিফ্জ করে নিয়েছিলেন। কোনো কিতাব তাকে জীবনে দ্বিতীয়বার দেখতে হতোনা। তাঁর এ অসাধারণত্ব দেখে একবার এক শিক্ষক বলেছিলেন : 'Ahmad Miyan, say whether you are a man or a jin. It takes me time to teach you but you memorise it in no time" (ঐ, পৃ-১২)

অর্থাৎ 'আহমদ মিয়া (আহমদ রেযা) তুমি জ্বিন না মানুষ? আমার পড়াতে সময় লাগে অথচ তোমার শিখতে সময় লাগে না"। আল্লাহ প্রদত্ত এ মহান নেয়ামত বিরল মেধাশক্তি'র সদ্ব্যবহার করেছিলেন আহমদ রেযা। শিক্ষার শেষ সনদ অর্জন দিবসে, মাত্র তের বছরের এ অসাধারণ বালক, স্তন্যপান সংক্রান্ত এক জটিল শরীয়তি মাসয়ালার এমন ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, সেদিন থেকে তাঁর পিতা নিজের ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব তরুণ আহমদ রেযা'র উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে থেকে শুরু করে অসংখ্য ফতোয়া প্রদান করে তিনি মুসলিম বিশ্বের আইন ভান্ডার কে সমৃদ্ধ করে যান, যা হাজার পৃষ্টা সম্বলিত এক একটি খন্ডে সংকলিত হয়ে মোট বারো খন্ডের বিশাল গ্রন্থ ফতোয়ায়ে রেজভিয়া'তে পরিণত হয়। তাঁর ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডঃ কবি ইকবাল তাঁকে 'যুগের আবু হানিফা' বলে মন্তব্য করেছিলেন ১৯৩৩ সনের এক অনুষ্ঠানে। ডঃ ইকবাল একবার মন্তব্য করেন যে, আহমদ রেযা খাঁন কীরূপ উচ্চ পর্যায়ের ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি ভারতীয় উপ-মহাদেশের কেমন যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ পন্ডিত এবং অনন্য সাধারণ আলিম ও ফকীহ ছিনলে তাঁর ফতোয়া সমূহ অধ্যয়ন করলে তৎসম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। (ইসলামি বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)। তাঁর মতাদর্শ বিরোধীদের মধ্যেও তাঁর বিশাল ফতোয়া গ্রন্থের প্রশংসাকারী পাওয়া যায়। নদওয়াতুল ওলামা (লক্ষ্ণৌ) পরিচালক

মৌলানা আবুল হাসান আলী নদভীও এ গ্রন্থকে 'নজীর বিহীন' বলে উল্লেখ করেন। (নুজহাতুল খাতির, ৮ম খন্ড, পৃ-৩৯, সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খন্ড)

কোরানে করীমের উর্দু অনুবাদ 'কানজুল ঈমান' তাঁর অপর এক অপ্রতিদ্বন্দ্বি অবদান। বর্তমানে ইংরেজীতে এর অনুবাদ করেছেন চার জন গবেষক। সিন্ধু, ডাস, তুর্কী, হিন্দি, রোমান ও হাঙ্গেরি ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে। মৌলানা আবদুল মান্নান কানজুল ঈমান'র বঙ্গানুবাদ করে একটি বিশুদ্ধ কোরান অনুবাদ উপহার দিয়েছেন। আবার এ কানজুল ঈমান এর ভাবধারায় লিখিত হয়েছে চৌদ্দ পনেরটি তাফসীর গ্রন্থ। (সূত্র- আ'লা হযরত এক অসাধারণ মনীষা, পৃ-২১, মৌলানা বদিউল আলম রিজভী)। নবীজির প্রেমে উৎসর্গীত তাঁর এক অন্যন্য কাব্য গ্রন্থ 'হাদায়িকে বখশিষ'। এ কাব্য গ্রন্থ নিয়ে এ পর্যন্ত ইউরোপ-আফ্রিকা-আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারত, পাকিস্থান পর্যন্ত হয়েছে ব্যাপক গবেষণা। এম.ফিল.পি.এইচ.ডি নিয়েছেন অনেকে। উর্দু, আরবী, ফার্সী, হিন্দি ভাষায় রচিত তাঁর নাত-হামদগুলো সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ইফ্‌তিখার আজমী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রচিত না'ত কবিতাবলী এরূপ উচ্চ পর্যায়ের যে, তাঁকে প্রথম শ্রেণীর না'ত কবিতা রচনাকারী কবিদের মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত। (ইসলামি বিশ্বকোষ ২য় খন্ড)। তাঁর না'ত গুলো সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসে পাঠ্য সূচীভুক্ত হয়েছে। প্রফেসর গিয়াসুদ্দীন কুরাইশি এ না'ত গুলো ইংরেজী অনুবাদ করেছেন যা ইংল্যান্ডের ইসলামিক টাইম সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ ফজলুর রহমান ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার প্রভাষক হাফেজ আনিসুজ্জামান বাংলায় এর কাব্যানুবাদ এবং সাংবাদিক এ,কে,এম, ফজলুর রহমান মুনশি গদ্যানুবাদ করে যাচ্ছেন। গত বছর মিশরের আল আজহারের ছাত্র মমতাজ আহমদ ছদীদি তাঁর কাব্য সাহিত্যের উপর এম,ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আ'লা হযরত আহমদ রেযা খাঁন এর বিভিন্ন দিক নিয়ে অন্তত কয়েক ডজন পি.এইচ.ডি ইতোমধ্যে সফল ভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে। মোটকথা, ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) তাঁর শৈশব থেকে মৃত্যু বিছানায় থাকা পর্যন্ত যে কলম সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন তা গবেষকদের অনুমানে প্রায় দেড় হাজারের মতো গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। একজন মানুষের পক্ষে এতো অধিক গ্রন্থ লিখা যেমন রীতিমতো বিস্ময়কর; তার চেয়েও বেশি অবাক হতে হয় তাঁর লিখিত বিষয়গুলোর বৈচিত্র্য দেখে। এ বিশাল গ্রন্থ ভান্ডারে শুধু কোরান-হাদীস-ফেকাহ-কাব্য সাহিত্য দেখা যায়না, অধিকন্তু সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে তাঁর দেওয়া নতুন নতুন তথ্য মূলক বইও পাওয়া যায়। জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতি সহ মোট পঞ্চাশেরও অধিক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব পাওয়া যাচ্ছে। গণিত শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার ব্যাপারে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার জিয়াউদ্দিনের স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য।-স্যার জিয়াউদ্দিন ছিলেন সে সময়ের ভারতবর্ষের সেরা গণিত

শাস্ত্রবিদ। অথচ একবার তিনি গণিতের একটি বড় ধরণের সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত বর্ষের সকল গণিত শাস্ত্রবিদদের দারস্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত জার্মান যেতে প্রস্তুত হন। এ সময় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সৈয়দ সুলায়মানের অনুরোধে তিনি জার্মান যাবার আগে ইমাম আহমদ রেজার কাছে যান এবং তাঁর সে সমস্যা তুলে ধরতেই অতি সহজে এর একটি গাণিতিক সমাধান দিয়ে দেন আ'লা হযরত। এ ব্যাপারে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্যার জিয়াউদ্দিন বলেন-আমার প্রশ্ন যা খুব কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিলো, অথচ তিনি অনায়াসে এমন তড়িৎ উত্তর দেন যে, মনে হয়েছে যেন এটার উপর তাঁর দীর্ঘকালের গবেষণা রয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে এটা জানার লোক নেই। (সূত্রঃ একরামই আহমদ রেযা, ভূমিকা, লাহোর ১৯৮১) মৌলানা যুফর উদ্দিন বিহারী তাঁর 'হায়াত ই আ'লা হযরত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ১৩২৯ হিজরী/১৯১১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ডঃ স্যার জিয়াউদ্দিন দব্‌দবা-ই-সিকান্দরী (রামপুর) পত্রিকায় চতুর্ভুজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন প্রচার করেন যাতে কোন গাণিতিক এর উত্তর পেশ করেন। মাওলানা ব্রেলভী পরবর্তীতে পত্রিকার মাধ্যমে উক্ত প্রশ্নের জবাব দেন। সে সাথে উত্তর চেয়ে এ সংক্রান্ত অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে দেন। স্যার জিয়াউদ্দিন এ প্রশ্ন পাঠ করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন- একজন মৌলভী শুধুমাত্র জবাব দেননি বরং উল্টো প্রশ্ন করেও বসলেন। অতঃপর স্যার জিয়াউদ্দিন মাওলানা বেরলভী কৃত প্রশ্নের জবাব পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু মাওলানা বেরলভী ডক্টর সাহেবের জবাব ভুল প্রমাণ করে দেন, যা তাকে আরো হতবাক করে দেয়। (সূত্র : মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.) জীবন ও কর্ম পৃঃ ৩৪)। আমেরিকার প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিজ্ঞানী প্রফেসর আলব্রেট ১৮ অক্টোবর ১৯১৯ ইংরেজী এক্সপ্রেস পত্রিকায় ভবিষ্যতবাণী করে বলেন যে, কয়েকটি গ্রহ সূর্যের সামনে চলে আসার দরুন উদ্ভূত মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীতে প্রলয়কান্ড ঘটাবে। আ'লা হযরত তার এ ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রমাণ শুধু করেননি বরং জ্যোতিষবিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে তিনটি আলাদা গ্রন্থ রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এগুলো হলো- ১) ফওযুল মুবিন দর রদ্দ হরকতে জমিন ২) নযুলে আয়াতে ফোরক্বান বিসকুনে যমীন ও আসমান ৩) আল কালিমাতুল মুলহামাতু ফীল হিকমাতিল মুহকামা লিওহায়ীন ফালসাফাতিল মুশমমাহ্। ফেকহ-ফতোয়াকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আ'লা হযরত কোনো কোনো সময় আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে ও স্থান দিয়েছিলেন তাঁর লেখায়। Phonography & Photography সংক্রান্ত তাঁর এমন একটি কিতাব হলো- 'আল বয়ানু শাফিয়া হকমে ফনোগ্রাফিয়া'। এ কিতাবে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'শব্দ' সম্পর্কে এক দারুন বিশ্লেষন উপস্থাপন করেন। শব্দ সম্পর্কে তার এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে শব্দ কি, কীভাবে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং কীভাবে শ্রবণে আসে, শব্দ সৃষ্টির পর শূন্যে থাকে নাকি ধ্বংস হয়ে যায়, কথকের সাথে শব্দের সম্পর্ক সহ আরো নতুন নতুন দিক। যা আ'লা হযরতকে একজন পদার্থ বিজ্ঞানীর কাতারেও শামিল করেছে। সময় বিদ্যা বা ইলমে তাওক্বীত, যফর বা ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা সংক্রান্ত

জুফরি বিজ জুফর। বীজগণিতের 'লগারিদম' বিষয়ে তাঁর একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ১৯৮০ সালে করাচি থেকে প্রকাশিত হয় এবং ত্রিকোনমিতি বিষয়ে রয়েছে স্বতন্ত্র পুস্তক যা লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। আহমদ রেযা বেরলভী মূলত ইসলামি মুজতাহিদ। তাঁর সকল গবেষণা লেখালেখি ইসলামি সমস্যাবলীর সমাধানে নিয়োজিত। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলোনা। বরং ইসলামের বিভিন্ন জটিল বিষয়কে সহজসাধ্য বা সার্বজনীন করার লক্ষেই তিনি মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করতেন। যেমন, তায়াম্মুম এর মাসয়ালার সাথে মাটির সম্পর্ক আছে বলেই তিনি মাটির গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন বিশদভাবে, যা মৃত্তিকা বিজ্ঞান (Soil Science) 'র একটি অমূল্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। একইভাবে অজুর পানির গুণাগুণ বর্ণনায় খোলা পানি, চলমান পানি, বদ্ধপানি, কূপের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। নামাজের সময় সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্যই তিনি ইলমে যুফর বা সময় বিদ্যা সংক্রান্ত কিতাব লিখেন। ঘড়ি না দেখে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েই তিনি সঠিক সময় বলে দিতেন- যেখানে একটা মিনিটও এদিক-ওদিক হতোনা। উল্লেখ্য, বর্তমানে মসজিদগুলোতে যেসব স্থায়ী ক্যালেন্ডার দৃষ্ট হয় তাও তাঁর আবিস্কার।

মোটকথা, ইমাম আহমদ রেযা এক বিস্ময়কর জ্ঞানভান্ডারের মালিক এবং শতাব্দির এক মহান সংস্কারক ব্যক্তিত্ব। আজ পৃথিবীর দেশে হৈ চৈ পড়ে গেছে তাঁকে নিয়ে। দেরীতে হলেও আজ তিনি আলোচনায় আসছেন। যা গৌরবান্বিত করবে আমাদের সকলকে। আসুন জ্ঞানের এ বিশ্বকোষ নিয়ে গবেষণা করি।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The Reformer of Muslim World; By, Pro Dr. Muhammed Mas'ud Ahmed, Karachi Pakistan.

2. The light; By Prof. Dr. Mas'ud Ahmed, Pakistan.

3. Economic guide lines for muslims: Proposed by Imam Ahmed Reza Khan in 1912 A.D. By, Prof. Mohamad Rafiullah Siddiqui. English versin : Prof. M.A. Qadir, Karachi, Pakistan.

4. Naglected Genious of the East, By Prof. Dr. Muhammaed Mas'ud Ahmed, Pakistan.

৫. স্মরণিকা'৯৯/স্মরণিকা ২০০০/স্মরণিকা২০০১, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৬. স্মরণিকা 'আ'লা হযরত;' আ'লা হযরত ইসলামি পাঠাগার, কাটিরহাট, চট্টগ্রাম।

৭. ইমাম আহমদ রেযা জীবন ও কর্ম, মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম।

৮. আ'লা হযরত এক অসাধারণ মনীষা, মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী, চট্টগ্রাম।

৯. মোজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত, জে. আর. এম. রেজাউল আলম, চট্টগ্রাম।

১০. তরজুমান, সফর ১৪২২; চট্টগ্রাম।

১১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২তম খন্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

সমাপ্ত

আ'লা হযরত দর্শন

রাজনীতি ও অর্থনীতি

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

- কর্মনীতি (১৯৯৪)
- রাজনীতির আড়াইশ বছর (১৯৯৬)
- শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯৭)
- নির্বাচন ও আপনার জবাবদিহীতা (২০০১)
- সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্ব (২০০২)
- সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস (২০০২)
- ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা (২০০২)
- গাউসুল আযম জিলানী (র.)'র সংস্কার ও ত্বরিকা (২০১০)
- সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন
- আ'লা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেন শাহে সিরিকোট
- দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত
- ইসলামের মহান সংস্কারক গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্
- শরিয়ত-ত্বরিকতের যুগশ্রেষ্ঠ কান্ডারী গাউসে জামান
- সৈয়্যদ আহমদ ... সিরিকোটি (রহ.)
- গাউসে জামান ... শাহ্ (রহ.)
- শাহেন শাহে ... জীবনীগ্রন্থ) (প্রকাশিতব্য)

প্রাপ্তিস্থান

- **মুহাম্মদী কুতুবখানা**
  শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
- **রেজভী কুতুবখানা**
  শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
- **উজ্জীবন লাইব্রেরী**
  মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা সড়ক
  জয়েন্ট কোয়ার্টার, মুহাম্মদ, ঢাকা
- **জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল**
  ১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
- **তৈয়বিয়া লাইব্রেরী**
  সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা রোড, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।